মূল্য দশ আনা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
৩৮ নং জনসন রোড, ঢাকা ।

প্রথম সংস্করণ—১৩৪৯

মুদ্রাকর
শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র শূর
আশুতোষ প্রেস
ঢাকা

বাবা ও মা'র

শ্রীচরণে

আমার পূর্ব্ব-প্রকাশিত সাতটি গল্প নিয়ে 'হে বীর কিশোর' আত্মপ্রকাশ করল। গল্পগুলো বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের কাছে আমার সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করছি।

যে-সব বন্ধু-বৎসল বন্ধুদের অতি উৎসাহের প্রেরণায় গল্প-পুস্তক প্রকাশের দুঃসাহস করেছি, তাঁদের মধ্যে শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, সাংবাদিক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র মিত্র, কবি শ্রীযুক্ত দক্ষিণা বসু ও শিশু-সাহিত্যের যাদুকর শ্রীযুক্ত নীহার গুপ্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর সর্ব্বোপরি ধন্যবাদ জানাচ্ছি 'শিশুসাথী'র অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত হরিশরণ ধর মহাশয়কে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা না থাকলে 'হে বীর কিশোর' ফাইলের অন্ধকারেই থাকত আবদ্ধ।

সিরাজগঞ্জ কলেজ,
মহাসপ্তমী, ৮২ রবীন্দ্রাব্দ

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

এই লেখকের লেখা—

কিশোর-সাহিত্য :

- কিশোর সংঘ
- পথিক মানুষ
- ভূতের গল্প নয়
- ঘরছাড়া দিকহারা
- দুর্লভসা'র বাড়ী (যন্ত্রস্থ)

আস্তে পা ফেল। পায়ের তলায় ঝরা পাতার মর্ম্মর-ধ্ব তুলো না। চল চুপে চুপে। কোন কথা এখন নয়। নিঃশ্বাস ফেল ধীরে। নইলে যে তার ঘুম ভেঙে যাবে। সে যে ঘুমিয়ে আছে মাটি-মায়ের শীতল কোলে। ঘুমিয়ে আছে এক কিশোর বালক ; নাম তার শেখর।

শোন তবে সে কাহিনী। অনেক দিন আগেকার কথা। যশোরেশ্বরীর চোখে তখন প্লাবন। যশোর-সিংহ

প্রতাপাদিত্য বন্দী হয়েছেন মোগলের হাতে। দেশ গিয়েছে মোগলের অধীনে; কিন্তু দেশবাসী তখনও মেনে নেয় নি বিদেশীর প্রভুত্ব। তাই ছোট-খাট যুদ্ধবিগ্রহেরও অন্ত নেই। সুযোগ পেলেই তা'রা মোগলের শিবির আক্রমণ করে—তাদের রসদ ও ধনরত্ন লুট করে, আবার গা ঢাকা দেয়। রাজধানী হ'তে নূতন সৈন্য-সামন্ত আসে; অত্যাচার-উৎপীড়ন চলে। তারপর ধীরে সব ঠাণ্ডা হয়ে আসে।...এমনি ক'রে চলে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ—মানুষের জীবন নিয়ে চলে ছিনিমিনি খেলা।

তেমনি এক দিনে—সবে সূর্য্য উঠেছে। পাখীর গানে নূতন সূর্য্যের বন্দনা। বাতাসে সাগর-জলের শিহরণ পৃথিবী স্নিগ্ধতায় ভরা।

বাড়ীর সাম্‌নে ঘাসে-ঢাকা মাঠ। মাঝখানে একটি বকুলগাছ। গাছের তলায় মাটির বেদী বাঁধানো—তকৃতকে ঝকৃঝকে; ঝরা বকুলে সাজানো যেন দেবতার আসন। সেই বেদীর উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে শেখর। চোখ দুটি বন্ধ। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যকিরণের আল্‌পনা আঁকা পড়েছে তার সারা দেহে। বকুল ঝ'রে পড়ছে পুষ্পবৃষ্টির মত।

গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুড়ুম্!—

অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ! আকাশের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত যেন থর্‌থরিয়ে কেঁপে উঠল। শেখর তেমনি

শুয়েই চোখ মেলে চারদিকে তাকালে। বারো বছরের ছেলে। কিন্তু এতটুকু বিস্ময় জাগল না তার মনে। মোগলের বন্দুকের শব্দ তখন নিত্যকারের ব্যাপার, তাতে বিস্ময়ের কি-ই বা আছে! তা' ছাড়া, তার বাবা তো সম্রাটের সাথে বন্ধুত্বই করেছেন। বন্দুকের শব্দে তার ভয়ই বা কি?

গুড়ুম্—গুড়ুম্—

আরও ছ'বার বন্দুকের শব্দ হ'ল। কার যেন চাপা চীৎকার বাতাসে ভেসে এল।

শেখর এবার উঠে বসল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল চারদিক। শব্দ এসেছিল ডানদিক হ'তে। মাঠের সেদিকটায় অনেকখানি জায়গা জঙলায় ঢাকা। সেই জঙ্গলের ওপার দিয়ে যাতায়াতের পথ। সেদিকে ভাল ক'রে চেয়েও শেখর কিছু দেখতে পেল না। একবার পেছন ফিরে বাড়ীর দিকে তাকালে। বাবা বাড়ী নেই; কাক-ভোরে উঠে কোথায় গেছেন, এখনও ফেরেন নি।

বাবার কথা মনে হ'তেই শেখরের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তাঁর কোন বিপদ ঘটে নি তো? ভাবতেই শেখরের চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল। পৃথিবীতে ও যে বাবা ছাড়া আর কাউকে জানে না। মায়ের কথা শেখরের আব্‌ছা মনে পড়ে। জ্ঞান হবার পর হ'তে ও যে শুধু বাবাকেই দেখে আসছে। বাবার সাথে না বসলে খাওয়া হয় না; বাবার পাশে না শুলে ঘুম

হয় না; বাবা দেখিয়ে না দিলে তলোয়ারের প্যাঁচ মনে থাকে না।

একটা খস্-খস্ শব্দে শেখরের চমক ভাঙল। একলাফে জঙলা হ'তে বেরিয়ে একটা লোক ওর দিকে এগিয়ে আসছে। চোরের মত সে পা ফেলছে ও এদিক-ওদিক চাইছে ভয়ার্ত্ত চোখে। লোকটির দিকে ভাল ক'রে চেয়ে শেখর চম্‌কে উঠল। তার হাঁটুর নীচে একটা জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। পরণের কাপড় রক্তাক্ত।

"শীগ্‌গির আমাকে কোথাও লুকিয়ে ফেল। ওরা এসে পড়ল প্রায়।"—অতিকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে সে কথা কয়টি বলল।

শেখর শুধালে—"তুমি কে? তোমার এ দশা হয়েছে কেন?"

লোকটি জবাব দিল—"আমি একজন যশোরবাসী। এই আমার যথেষ্ট পরিচয়। মোগলের বন্দুকের গুলিতেই আমার এই অবস্থা।"

শেখর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলল—"তা'রা তোমাকে গুলি করল কেন?"

—"কারণ, যশোর-সিংহ প্রতাপাদিত্যের হয়ে তাদের বিপক্ষে আমি লড়েছিলাম।"

লোকটি ধীরে ধীরে সব কথাই খুলে বলল। মোগলের

সঙ্গে রণে পরাস্ত হয়ে সে বন্দী হয়েছিল মোগল-শিবিরে। তারপর আজ ভোরে অসতর্ক প্রহরীর অস্ত্র হাতে নিয়ে তারই সাহায্যে সে বেরিয়ে পড়েছে বন্দীশালা হ'তে। খবর পেয়ে মোগলেরা পিছু নিয়েছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে এক হিন্দু সেনাপতি। তারই হাতের বন্দুকের গুলিতে সে আহত হয়েছে।

তারপর লোকটি উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলল—"বড় শ্রান্ত আমি। আর এগুতে পারি না। শীগ্‌গির কোথাও আমাকে লুকিয়ে ফেল।"

শেখর জঙলার ওপারের পথের দিকটা ভাল ক'রে দেখে বলল—"কিন্তু তোমাকে তো আমি আশ্রয় দিতে পারি না, তুমি সম্রাটের বন্দী।"

লোকটি মাথা উঁচু ক'রে ব'লে উঠল—"কে বলে আমি এখন বন্দী ; আমারই দেশের মাটিতে আমি কেন বন্দী হ'ব ? আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন।"

শেখর বিস্মিত হয়ে লোকটির দিকে চাইল ; তারপর বলল—"তা' ছাড়া, বাবা এখন বাড়ী নেই, এ অবস্থায়···"

চারদিক চেয়ে লোকটি শুধাল—"কে তোমার বাবা ?"

—"আমার বাবার নাম জান না তুমি ? আমার বাবা সুজন রায়।"

লোকটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠল—"সুজন রায়ের

ছেলে তুমি? আমারই ভুল হয়েছে তোমার কাছে আশ্রয় চাওয়া।”

শেখর তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল—“কেন?”

—“আর কেন? প্রাণের ভয়ে যে মোগলের পায়ের তলায় মাথা নত করেছে, তুমি যে তারই ছেলে!”

—“কিন্তু তুমি জান না, আমার বাবা কখনও প্রাণের ভয় করেন না।”

ঈষৎ হেসে লোকটি বলল—“জানি সব। সুজন রায়ের বীরত্বের কথা কে না জানে? কিন্তু বুড়োকালে কেন যে তার এ দুর্ম্মতি হ'ল—”

জঙলার ওপার হ'তে একটা কোলাহল ভেসে এল। লোকটি সেদিকে একবার চেয়ে সাম্‌নে পা বাড়াতেই শেখর শুধাল—“কোথায় চললে তুমি?”

—“যেখানেই হোক্, এখানে দাঁড়িয়ে তো ধরা দিতে পারি না।”

শেখর একলাফে তার সাম্‌নে এসে দৃপ্তকণ্ঠে বলল—“তুমি এস। আমি তোমায় আশ্রয় দিলাম।”

লোকটি আশাভরা গলায় বলল—“পারবে তুমি? মোগলের ভয়ে—”

বাধা দিয়ে শেখর বলল—“যেও না, আমার বাবা বীরশ্রেষ্ঠ সুজন রায়। এস—”

শেখর বাড়ীর দিকে পা বাড়াতেই লোকটি শুধাল—"ওদিকে কোথায় যাব ?"

—"এই আমাদের বাড়ী। বাবা বাড়ী নেই। তা হোক না, আমিই তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

—"কিন্তু মোগলেরা যে এখনি এসে এ বাড়ী খানাতল্লাস করবে!"

—"সে ভার আমার। আমিও তলোয়ার ধরতে জানি।"

শেখরের তলোয়ার মুহূর্তের মধ্যে কোষমুক্ত হয়ে সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মকিয়ে উঠল। লোকটি খুশী হয়ে বললে—"তোমার বীর মনের প্রশংসা করি ভাই। কিন্তু এতে তো কোন লাভ হবে না। তা'রা যে সংখ্যায় অনেক বেশি। তার উপর আছে সেই বন্দুকধারী কুলাঙ্গার যশোরবাসী।"

শেখর চিন্তিতমুখে শুধালে—"তা' হ'লে কি হবে? তোমাকে যে আশ্রয় দিয়েছি! বাবার মুখে শুনেছি, এই রায়-বাড়ী হ'তে আশ্রয়প্রার্থী কোনদিন বিমুখ হয় নি।"

লোকটি এদিক-ওদিকে চেয়ে মাঠের বাঁ-দিকের খড়ের গাদাটা দেখিয়ে বলল—"তুমি এক কাজ কর। এই খড়ের গাদার মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখ। মোগলেরা এলে বলবে—তুমি কিছু জান না। কেমন?"

শেখর সম্মতি জানাল; তারপর তাড়াতাড়ি ক'রে গাদা হ'তে খানিকটা খড় তুলে লোকটিকে হাতে ধ'রে নিয়ে সেখানে

বসিয়ে দিল। অতি সাবধানে সে তার উপরে পুরাণো খড় দিয়ে দিল ঢেকে। তারপর কি মনে ক'রে এক দৌড়ে বাড়ীর

ভিতর থেকে নিয়ে এল তার পোষা মিনি বিড়ালটাকে, আর সেটাকে বসিয়ে দিল ঢেকে-দেওয়া খড়ের ঠিক উপরে ; যাতে কারও মনে এতটুকু সন্দেহ না জাগতে পারে।

সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে শেখর আবার শুয়ে পড়ল বকুলতলার বেদীতে। বকুল তখনও ঝরছে অবিরাম ঝর্-ঝর্-ঝর্। এমন সময় জঙলার মাথায় মোগলদের মূর্ত্তি দেখা দিল। সকলের সাম্‌নে ছিল এক বন্দুকধারী। শেখর আড়চোখে তাদের দেখে নির্ব্বিকার হয়ে চোখ বুজল।

বকুলতলার ওপাশ দিয়েই রাস্তা। সেই রাস্তা থেকেই বন্দুকধারী মদন রায় হাঁক দিল—"কে ওখানে ঘুমিয়ে?"

কোন উত্তর নেই।

মদন রায় আবার শুধাল—"কে শুয়ে আছ, শীগ্‌গির উত্তর দাও।"

শেখর তবু নিরুত্তর। মদন এবার বেদীর পাশে এসে শেখরকে ধাক্কা দিল বন্দুকের বাঁট দিয়ে; আর সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল—"এই—ওঠো।"

আড়মোড়া ভেঙে শেখর উঠে বসল—যেন এইমাত্র তার ঘুম ভেঙেছে!

মদন শুধাল—"এই পথে একটি লোককে যেতে দেখেছ খোকা?"

শেখর চোখ মুছে জিজ্ঞাসা করল—"একটা লোক!"

—"হ্যাঁ—হ্যাঁ, একটা লোক। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পায়ে গুলির দাগ—"

শেখর কথার মাঝে ব'লে উঠল—"ওঃ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পায়ে গুলির দাগ?"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এখন দেখেছ কি-না তাই বল চট্‌পট্।"

শেখর খানিকক্ষণ কি ভেবে হাত ঘুরিয়ে বলল—"কৈ দেখি নি তো।"

—"দেখ নি? নিশ্চয়ই দেখেছ।"

—"আরে! আমি তো এতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমোলে আবার কেউ দেখতে পারে নাকি?"

—"ঘুম না ছাই। বন্দুকের শব্দে নিশ্চয়ই তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।"

শেখর এবার হো-হো ক'রে হেসে উঠল—"ও হরি! তোমার বন্দুকে এত জোরে শব্দ হয়! তবে তো শত্রুরা আওয়াজ শুনে পালিয়েই যাবে। তার চেয়ে আমার তীর-ধনুকই ভাল। শাঁ ক'রে যেয়ে যেমন বুকে বেঁধা অম্নি অক্কা লাভ। দেখবে তুমি আমার তীর-ধনুক?"

মদন বলল—"না না। তীর-ধনুক তোমাকে দেখাতে হবে না। এখন শীগ্‌গির বল তো লোকটা কোথায়?"

তেম্‌নি নির্ব্বিকারভাবে শেখর জবাব দিল—"জানি না তো।"

মদন এবার আগুনের মত জ্বলে' উঠল—"ও সব চালাকী রাখ। সোজা কথায় বল লোকটি কোথায়।"

শেখর গম্ভীর হয়ে বলল—"আমি জানি না।"

—"নিশ্চয় তুমি জান। তোমার চোখ-মুখ বলছে তুমি জান। ভাল চাও তো এখনও বল, নইলে দেখছ তো এই বন্দুক, এক গুলিতে মাথার খুলী দেব উড়িয়ে।"

ব্যঙ্গের হাসি হেসে শেখর জবাব দিল—"তুমি জান—আমার বাবা সুজন রায়।"

নাম শুনেই মদন ঘাব্‌ড়ে গেল। শেখরের দিকে চেয়ে

খানিক চুপ ক'রে থেকে সৈন্যদের দিকে চেয়ে বলল—"এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা বৃথা। চল আমরা বাড়ীটা ভাল ক'রে খুঁজে দেখি। লোকটা নিশ্চয়ই এখানে কোথাও আছে। দেখছ না রক্তের দাগ এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে।"

মদন দলবল নিয়ে যেই বাড়ীর ভিতর ঢুকতে যাচ্ছিল শেখর তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বলল—"বাবা এখন বাড়ী নেই। এখন কাউকে বাড়ীর ভিতর ঢুকতে দেওয়া হবে না।"

মদন রায় ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলল—"সে কথা বুঝব তোমার বাবার সঙ্গে। ছেলেমানুষ তুমি, ছেলেমানুষের মত এক পাশে ব'সে থাক।"

কি মনে ক'রে শেখর আর উচ্চ-বাচ্য করল না। মদন রায় দলবল নিয়ে বাড়ীর ভিতরে ও আনাচে-কানাচে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

শেখর আড়চোখে একবার স্তব্ধ খড়ের গাদার দিকে চাইল। তার চোখে ফুটে উঠল সফল দুষ্টুমির হাসি।

খুঁজে পেতে মদন রায় ফিরে এল সদলে। কোন ফল হ'ল না। মদন নিরাশ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

শেখর মৃদু হেসে বললে—"বৃথা এখানে সময় নষ্ট ক'রে সে লোকটাকে পালাবার সুযোগ দিয়ে কি যে লাভ হচ্ছে তা' তো আমি বুঝতে পারছি না! তার চেয়ে ছুটে চ'লে গেলে বরং লাভ হ'ত না কি?"

কথাটা মদন রায়ের মনে লাগল। সে অবিলম্বে পথে নামল। সঙ্গীরাও তার পাছে পাছে পা চালিয়ে দিল। খানিকটা গিয়েই কি মনে ক'রে মদন ফিরে এল। শেখরের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে কোমরবন্ধের তল থেকে বের করল একখানা সুদৃশ্য ছোরা। সুবর্ণ-খচিত হাতলের

উপর বাঘের মুখ আঁকা। অগ্রভাগ সূচের মত তীক্ষ্ণ। সূর্য্যের আলোয় ছোরাখানা ঝক্‌মক্‌ ক'রে উঠল।···

শেখরের চোখেও সেই ছোরাখানি পাবার ইচ্ছা উঠল ঝল্‌মলিয়ে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তা' লক্ষ্য ক'রে মদন রায় শুধাল—"নেবে তুমি এই ছোরাখানা?"

শেখর মনের প্রবল ইচ্ছাটা চেপে রেখে বলল—“বড় হ'লে বাবাই আমাকে একখানা এনে দেবেন। এই দেখ না, কেমন তলোয়ার বাবা আমাকে দিয়েছেন।”

শেখর কোমরে ঝোলান তলোয়ার খুলে দেখালে। মদন হাতের ছোরাখানা শেখরের মুখের কাছে আরও খানিকটা তুলে ধ'রে বলল—“সে তো দেবেই। তুমি হ'লে বীরপুরুষ। এখন চট্‌পট্ ব'লে ফেল—এ জিনিসটা তুমি নিতে চাও কিনা ?”

শেখর লুব্ধদৃষ্টি দিয়ে ছোরাখানা দেখছিল ; লজ্জার সাথে বলল—“তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ।”

মদন জোর দিয়ে বলল—“না না, সত্যি বলছি। আচ্ছা বিশ্বাস না হয়, এই এরা সব সাক্ষী রইল। যে মুহূর্ত্তে তুমি ব'লে দেবে লোকটি কোথায় লুকিয়ে আছে, সেই মুহূর্ত্তেই এ ছোরা তোমার।”

মদন ছোরাখানাকে শেখরের চোখের সাম্‌নে নাচাতে লাগল। সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোয় বহুমূল্য রত্ন যেন ঝল্‌মল্ করছে ! শেখরের বুকের রক্ত বাজছে কলকল শব্দে। ভীষণ সংঘাত সেখানে। একদিকে আশ্রিতজনকে রক্ষার দায়িত্ব, অন্যদিকে এই মনোহর জিনিসটি পাবার লোভ।

ভাবতে ভাবতে অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে এক সময়ে শেখর ডান হাত বাড়িয়ে ছোরাখানা নিল, আর বাঁ-হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিতে

দেখালে পাশের খড়ের গাদাটি। বুঝতে কারও কিছু বাকী রইল না। মোগলেরা ক্ষুধিত বাঘের মত খড়ের গাদাটা তচনচ ক'রে ফেলল। তার ভিতর হ'তে বেরিয়ে পড়ল আহত লোকটি। চোখে তার তখন ভয়ের লেশমাত্র নেই—আছে শুধু তীব্র ঘৃণা। শেখরের কাছে এসে অস্ফুটস্বরে সে বললে—"বিশ্বাসঘাতক"; তারপর দারুণ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই ব'সে পড়ল। একজন মোগল এসে তাকে ধরল।

লোকটি ধীরে ধীরে বলল—"উঃ! একটু জল—"

শেখর পাশেই দাঁড়িয়েছিল, বলল—"আচ্ছা, আমি এনে দিচ্ছি।" ব'লে শেখর বাড়ীর দিকে দৌড়ে গেল।

লোকটি ক্ষীণকণ্ঠে বলল—"না না, ওর আনা জল আমি কিছুতেই খাব না। হও তুমি মোগল, তবু তোমার হাতের জলই চাই।"

এমন সময় বাঁ-দিকের বাঁক ঘুরে সুজন রায় সেখানে এসে হাজির হ'ল। তার সঙ্গে একজন অনুচর। সুজন এত সব লোকজন দেখে বিস্মিতকণ্ঠে শুধাল—"কি ব্যাপার? তোমরা কাকে চাও?"

মদন রায় নমস্কার জানিয়ে বলল—"আমরা সম্রাটের লোক। এই লোকটা বন্দীশালা থেকে পালিয়েছিল আজ ভোরে। এরই পেছনে পেছনে এতক্ষণ হয়রান। উঃ! কম

ভোগান্তি ব্যাটা আমাদের দিয়েছে। দু'জন কারারক্ষীকে মেরেছে; আর একজনও গুরুতর আহত। যা হোক, এতক্ষণে ব্যাটাকে বাগে পেয়েছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তোমার ছেলের জন্যেই একে ধরতে পেয়েছি, নইলে···”

সুজন বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে উঠল—“আমার ছেলে ?”

মদন হাসিমুখে জবাব দিলে—“হ্যাঁ, তোমার ছেলে।”

তারপর আগাগোড়া সব কথা সে খুলে বলল। সুজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীরকণ্ঠে শুধু বলল—“হুঁ।”

সুজন রায়কে অভিবাদন জানিয়ে মদন রায় বন্দীকে নিয়ে দলবল সহ চ'লে যাচ্ছিল। এমন সময় একহাতে দুধের বাটি নিয়ে শেখর হাজির হ'ল দ্রুত পায়ে।

“দুধটা দুইয়ে আনতে দেরী হয়ে গেল।” ব'লেই শেখর দুধের বাটিটা বন্দীর দিকে এগিয়ে ধরল।

বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দুটির এক ঝট্‌কায় দুধের বাটি মাটিতে ফেলে দিল। তারপর ক্ষুব্ধ আক্রোশে পা দিয়ে সব দুধটা মাড়িয়ে দিতে লাগল। তার চোখ তখন রাগে ও ঘৃণায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলছে। সুজন রায়ের দিকে চেয়ে সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল—“যেমন বাপ তেমনি ছেলে। বিশ্বাস-ঘাতকের বংশ।”

সুজন রায়ের হাত মুহূর্তমধ্যে কোমরের তরবারি স্পর্শ

করল। কিন্তু তরবারি কোষমুক্ত হ'ল না। হাত নিস্তেজ হয়ে নেমে এল। আহত ভুজঙ্গ বিষধর ফণা উদ্যত ক'রে আবার তা' নামিয়ে নিল। আঘাত করা হ'ল না।

মদন রায়দের পদধ্বনি জঙ্গলার মাঝে মিলিয়ে গেল। সূর্য্য আরও খানিকটা এগিয়ে এল মাথার উপর। চারদিক থম্-থম্ করছে—যেন ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ।

সুজন রায়, শেখর ও অনুচর নির্জীবের মত তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। কারও মুখে কথা নেই। সহসা শেখরের কোমরে চোখ পড়তেই সুজন জ্বলে' উঠল—"কোথায় পেলে এ ছোরা?"

শেখর কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল—"ওই লোকটা দিয়েছে।"

একলাফে এগিয়ে যেয়ে সুজন ছোরাখানি বের ক'রে নিল; তারপর সাম্‌নের বকুলগাছটাকে লক্ষ্য ক'রে দিল ছুড়ে। বকুলগাছে বিঁধে ছোরাখানা কাঁপতে লাগল। পাগলের মত দৌড়ে গিয়ে সুজন নিজের তলোয়ার দিয়ে ছোরাখানাকে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। ছোরা দুই খণ্ড হয়ে গেল। একখণ্ড বিঁধে রইল বকুলগাছে। আর একখণ্ড বেদীর উপর ছিটকে পড়ল।

কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে সুজন ফিরে দাঁড়াল; শেখরকে বলল—"এস।"

ছোরাখানাকে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল

অনুচর এগিয়ে এসে ভীতকণ্ঠে শুধাল—"কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে ? ও ছেলেমানুষ !"

বড় দুঃখের মাঝেও সুজনের ঠোঁটে ফুটে উঠল ব্যঙ্গের হাসি, বলল—"আমি ওর বাবা, তুমি নও।...এস শেখর।"

মন্থরগতিতে দুইজনে ঢুকল সেই জঙ্গলে। একটা বড় গাছের তলায় এসে সুজন বলল—"দাঁড়াও।"

যন্ত্রচালিতের মত শেখর দাঁড়াল।

—"ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর শেখর।"

—"আমাকে মেরো না বাবা, মেরো না। আমি বুঝতে পারি নি।"

গম্ভীর কম্পিতকণ্ঠে সুজন রায় বলল—"বুঝতে না পারার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।"

—"আমাকে এবারকার মত ক্ষমা—"

—"না না, তোমার পাপের ক্ষমা নেই। তুমি তো জান, তুমি কি করেছ ? আমার কত বড় স্বপ্নকে ধূলিতে লুটিয়ে দিয়েছ। আজীবন দেশের সেবা ক'রে, দেশ-মাতৃকার পূজা ক'রে, এই বৃদ্ধবয়সে যে মোগলের পায়ের তলায় মাথা নুইয়ে দিয়েছিলাম, সে কেন ? শুধু তোর জন্যে—ওরে, শুধু তোকে বাঁচিয়ে রাখব ব'লে।"

সুজনের কণ্ঠস্বরে অশ্রুর প্লাবন বয়ে আসছিল। সহসা সতর্ক হয়ে সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল—"বড় আশা ছিল, তোরই জন্যে

বিশ্বাসঘাতকতার যে কলঙ্ক বরণ করেছি, তোকে বাঁচিয়ে রেখে বীর ক'রে গ'ড়ে তুলে, তোরই দেশসেবার দ্বারা সে কলঙ্ক মোচন করব। কিন্তু সে আশা আজ নিঃশেষ। দেখলাম, এরই মধ্যে আমার পাপ তোর মধ্যে সংক্রামিত হ'তে আরম্ভ করেছে। আমার বিশ্বাসঘাতকতা তোর বুকেও ছোবল বসিয়েছে। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি এর ভীষণ পরিণতি—তোর অসুন্দর জীবন—"

সুজন আর বলতে পারল না। দুই হাতে চোখ ঢাকল দারুণ হতাশায়।

সব চুপ। চারদিক স্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু বাতাসের ক্ষীণ করুণ কান্না। সে স্তব্ধতা ভেঙে প্রথম কথা বলল শেখর—"আমি প্রস্তুত বাবা। প্রার্থনা শেষ—"

সুজন উন্মাদ-কণ্ঠে ব'লে উঠল—"শেষ! বেশ, তবে সোজা হয়ে দাঁড়া। বল্—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

শেখর অকম্পিত-কণ্ঠে বলল—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

তারপর—সেই স্তব্ধ বনভূমির কানে বাজল একটি কিশোর-কণ্ঠের কাতর আর্ত্তনাদ—একটি ভাগ্যহীন পিতৃ-হৃদয়ের বুকভাঙা হাহাকার!

সেই হাহাকারে কতবার গভীর নিশীথে বনানীর ঘুম

ভেঙে গেছে—চাঁদের চোখে জল ঝরেছে—নীল আকাশ ব্যথায় কালো হয়ে গেছে—ঝড় উঠেছে! ... ...

তাই বলছি আস্তে পা ফেল। চল চুপে চুপে। এইখানে সে যে ঘুমিয়ে আছে মাটি-মায়ের শীতল কোলে। ঘুমিয়ে আছে কিশোর বালক।...

স্কুলে যেয়েই সংবাদ পেলাম একটি নূতন ছেলে ভর্ত্তি হয়েছে আমাদের ক্লাসে। মাইনরে স্কলার। রেকর্ড মার্ক পেয়ে প্রথম হয়েছে। নাম সমুদ্রকৃষ্ণ সেন। চমৎকার নাম। সমুদ্রের মত সুনীল রং। সমুদ্রের মত অতলস্পর্শ গভীরতা। কল্পনায় ছেলেটির একটি ছবি আঁকলাম ; বড় ভাল লাগল।

ক্রমে পরিচয় হ'ল। ডাকনাম সাগর। সংসারে কেউ নেই ; একেবারে একা। আহা, বাবা, মা, ভাই, বোন— কেউ নেই ! মানুষ হয়েছে মামার সংসারে—যেন কাকের বাসায় কোকিলের দিনাতিপাত।

ছোট সহর। তারই উপকণ্ঠে পশুপতিবাবুর বাস। সংসারবিরাগী মানুষ। পাশের গ্রামের জমিদার-বাড়ীতে কি চাকরী করেন। প্রতি মাসের মাইনে ভাইদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটান।

কি সূত্রে পশুপতিবাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল জানি না। তবে সাগর পশুপতিবাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় পেল। সেখান হ'তেই স্কুল করে। সামান্য যা হাত-খরচের দরকার হয়, পশুপতিবাবুই চালান। ক্রমে আরও জানতে পারলাম—পশুপতিবাবুকে সাগর 'বাবা' ব'লে ডাকে।

অতি সাধারণভাবেই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের পথ ধ'রে একটি বছর কেটে গেল। বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল—সাগর ফার্ষ্ট তো হয়েছেই, তার উপরে সেকেণ্ড বয়ের চেয়ে তার নম্বর প্রায় একশোর বেশি। এক সংস্কৃত ছাড়া আর সব বিষয়েই সে ফার্ষ্ট।

হেড মাষ্টার অত্যন্ত রাশভারী লোক। কদাচিৎ তিনি কথা বলেন—তাও অতি সংক্ষেপে। সেই হেড মাষ্টার ক্লাস-প্রমোশন ডাকতে এসে সাগরের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন; বললেন—"Sagar is the brightest star in the firmament of my teaching life."

Brightest star! উজ্জ্বলতম নক্ষত্র! কথাগুলো আমাদের বুকে যেন অমর অক্ষরে লেখা হয়ে গেল। স্মৃতির

পাতায় আজও সে লেখা জ্বলজ্বল করে। কিন্তু কোথায় সাগর ? কোথায় সে প্রদীপ্ত নক্ষত্র ?

অদ্ভুত প্রতিভাবান ছেলে। ওর স্মৃতি-শক্তি অসাধারণ। মনে পড়ে—সেদিন এ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের ক্লাস। সবাই বাড়ী হ'তে লিখে এনেছি টাস্‌ক্‌। খাতা দেখে তাই একের পর এক দাঁড়িয়ে ব'লে যাচ্ছি। আমাদের লেখা সেন্‌টেন্‌সগুলো প্রায়ই ক্লাস-টিচারের পছন্দ হচ্ছে না। এ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের ব্যবহার বোঝাবার জন্য তিনি বড় বড় লেখকদের সব লম্বা লম্বা কটমট সেন্‌টেন্‌স ব'লে দিচ্ছেন। আমরাও সেগুলো টুকে নিচ্ছি বাড়ীতে মুখস্থ করব ব'লে।
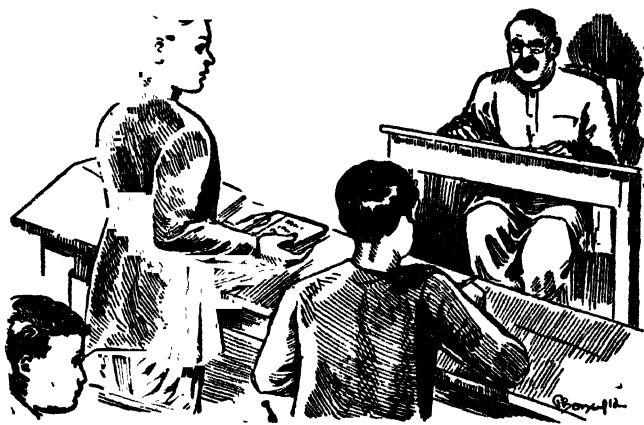
সাগরের হাত কিন্তু স্তব্ধ। ও লিখছে না একটি শব্দও—শুধু হাঁ ক'রে শুনে যাচ্ছে। ক্লাস-টিচার দুই-তিন বার

লক্ষ্য করলেন, তারপর একটু শ্লেষ ক'রে বললেন—"সাগর যে হাত গুটিয়ে ব'সে আছ ? তুমি কি একেবারে বিদ্যাসাগর ব'নে গিয়েছ নাকি ?"

সাগর দাঁড়িয়ে বলল—"না স্যার, পেন্সিলটা হারিয়ে গেল কিনা পথে, তাই। তবে আপনি যা বললেন, তা তো মনেই আছে, বাড়ী যেয়ে একেবারে ফেয়ার খাতায় তুলে নেব।"

ক্লাস-টিচার ক্ষেপে উঠলেন—"কি বললে ? চার-চারটে সেন্‌টেন্‌সই তোমার মনে আছে ? এসব ছেলেখেলা পেয়েছ ?"

সাগর নির্ব্বিকারকণ্ঠেই জবাব দিল—"তা কেন স্যার! মনে আছে, তাই বললাম।"

ক্লাস-টিচার দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন—"মনে আছে তাই বললাম! আচ্ছা, বলো দেখি কি কি সেন্‌টেন্‌স আমি বলেছি, বুঝি কেরামতী।"

যেন এ-বি-সি-ডি পড়ছে, এমনি সহজে সাগর চার-চারটে লম্বা সেন্‌টেন্‌সই অবিকল ব'লে দিল।

আমরা তো বিস্ময়ে হতবুদ্ধি। ক্লাস-টিচারের মুখ কালি। কিছুক্ষণ সাগরের মুখের পানে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তিনি বই বন্ধ ক'রে ক্লাস থেকে চ'লে গেলেন। ...

প্রায় বছরখানেক পরের কথা। সবে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছি। সে-কালে অপ্‌সন্যাল সাবজেক্ট নেবার ব্যবস্থা ছিল। তাই কি কি বিষয় যে নেব তাই নিয়ে স্কুলে জটলা

চলেছে নিজেদের মধ্যে। অনেকেরই ইচ্ছা, সাগর যে কম্বিনেশন নেয়, তাই নেবে। মনের ভাবটা এই—ও যদি একটু সাহায্য-টাহায্য করে, তা হ'লে চাই কি দুস্তর পরীক্ষা-সাগরটা কোনমতে অতিক্রম ক'রেও যেতে পারব। অতএব সাগর স্কুলে আসা পর্য্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল।

কিন্তু সাগর সেদিন স্কুলে এল না এবং আর কোন দিনই এল না। অকস্মাৎ সমুদ্র শুকিয়ে গেল! উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিটকে গেল আমাদের চেনা আকাশ হ'তে। সাগর নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! কেন? ··· ···

পশুপতিবাবুর ছোট ভাইয়ের শ্বশুর এসেছেন জামাই-বাড়ী বেড়াতে। কেমন ক'রে তাঁর কোটের পকেট থেকে পাঁচ টাকার একখানি নোট গেল উধাও হয়ে। প্রথম কুটুম-বাড়ী এসেছেন, চক্ষু-লজ্জায় প্রথমটা তিনি কথাটা বললেন না কাউকে। কিন্তু কথায় কথায় সবই বেরিয়ে পড়ল। বাড়ীময় হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। ছিঃ ছিঃ! নূতন কুটুম! তাঁর পকেট থেকে নোট চুরি! লজ্জায় সকলের মাথা কাটা যেতে লাগল। শ্বশুর মশায় যত বলেন—"আহা, থাক্ থাক্, পাঁচটা টাকাই তো", সকলে ততই ব্যস্ত হয়ে উঠেন—"আজ্ঞে না, টাকার কথা শুধু নয়, এ যে মান-মর্য্যাদার কথা। একটা হিল্লে এর করতেই হবে।"

বিকেল বেলা। স্কুল থেকে ফিরে সাগর উঠানে পা

দিয়েছে। বাইরের ঘরে অনেক লোকের জটলা—বাড়ীর ছেলে-বুড়ো অনেকে ; আশে-পাশের লোকও রয়েছে। এদিকে-ওদিকে কয়েকটা খোলা স্যুটকেস-তোরংগ।

সাগরকে দেখেই ছেলেমেয়েরা কলরব ক'রে উঠল—"এই যে সাগরদা এসেছে। এস সাগরদা, এবার তোমার পালা।"
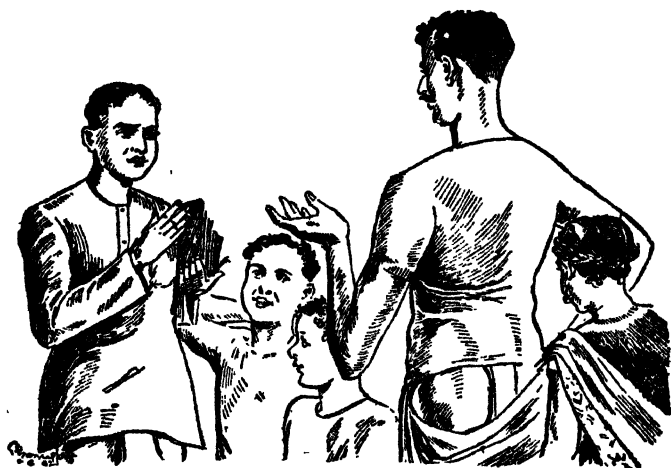
পশুপতিবাবুর মেঝ ভাই গম্ভীর নির্দ্দেশে বললেন—"তোমার স্যুটকেসটা নিয়ে এস সাগর, সকলের সাম্‌নে একবার খুলে দেখাও।"

দপ্‌ ক'রে সাগরের রক্তে আগুন জ্বলে' উঠল। সমস্ত শরীর জ্বালা করতে লাগল তার তীব্র দহনে। শুধু ছোট একটি প্রশ্ন করল—"কেন?"

—"তাওই মশায়ের কোটের পকেট হ'তে পাঁচটা টাকা পাওয়া যাচ্ছে না কাল সকাল থেকে—"

—"আপনার কি ধারণা, সে টাকা আমি চুরি করেছি?"

—"না, ঠিক তা নয়। তোমাকে আমরা সে রকম ছেলে মনে করলে বাড়ীতে থাকতে দিতাম না।"

সত্যি তো, সাগর এ-বাড়ীর কেউ নয়। আশ্রিত কুকুরের চেয়ে তার মর্য্যাদা এখানে এক তিলও বেশি নয়। তবু সাগর শুধাল অতি কষ্টে—"তবে?"

—"টাকাটার কোন আস্কারাই যখন অন্যভাবে হ'ল না, তখন বাধ্য হয়ে সকলকেই খানাতল্লাসী করা হচ্ছে।"

ঢোক গিলে সাগর প্রশ্ন করল—"আর সব ছেলেদের স্যুটকেস-বাক্স দেখা হয়েছে?"

কে-একজন অধৈর্য্য-কণ্ঠে বলল—"হ্যাঁ-হ্যাঁ হয়েছে। শুধু ছেলেদের নয়, মেয়েদেরও।"

"ওঃ" ব'লে সাগর চুপ করল। একটু পরে বলল—"বাবার ট্রাঙ্ক-স্যুটকেসও দেখা হয়েছে?"

পশুপতিবাবুর মেঝ ভাই এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন—"তাতে তোমার কাজ কি? তোমার কাজ যা তাই ক'রে ফেল চট্‌পট্।"

সাগর দৃপ্ত-কণ্ঠে বলল—"না। বাবার স্যুটকেস খানা-তল্লাসী না হওয়া পর্য্যন্ত আমার স্যুটকেস খোলা হবে না।"

অকম্পিত অগ্নি-শিখার মত সাগর বাড়ীর ভিতরে চ'লে গেল। পিছনে হ'তে কে যেন বলল—"ইস্—বাবা! কি আমার ছেলেরে! তবু যদি তিনকুলে কেউ থাকত!"

মেঝ ভাই আত্মসম্মানের জ্বালায় টং। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—"দাদা নাই দিয়েই তো এই করেছেন। আসুক দাদা ফিরে, হয় ওই সাধের পুত্তুরই থাকুক এ বাড়ীতে, নয় আমরা থাকি। এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার মুখের উপর কথা—"

জল-খাবার না খেয়েই সাগর বেরিয়ে গেল বাড়ী হ'তে। মাঠের একপাশে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। বেশ একটু শীত পড়েছে। শিশিরে ঘাসগুলো গেছে ভিজে। শুক্লা ষষ্ঠীর বাঁকা চাঁদ উঠেছে আকাশে। তারই পানে চেয়ে চেয়ে সাগরের বুক হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠল। কেউ নেই, ওর কেউ নেই। কিন্তু ওর বাবা? পশুপতিবাবু? তাঁর স্নেহ? তাঁর ভালবাসা? ...সাগরের দু'চোখ বেয়ে নামল অঝোর অশ্রুধারা।

একটু রাত ক'রেই সাগর বাড়ী ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'ল কথার অগ্নি-বাণ। মেজ ভাই পাড়া মাথায় ক'রে বলছেন—"তখনই বলেছিলাম, কাজ নেই ওসব হা-ঘরে ছেলে বাড়ীতে এনে। তা দাদা একেবারে পুত্রস্নেহে গ'লে গেলেন। বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলো পর্য্যন্ত পর হয়ে গেল। এখন ঠেলা সামলাও। মায় বাড়ীটাকে চোরের আড্ডাখানা ক'রে তোল।"

ব্যাপার বুঝতে বেশি দেরী হ'ল না। সাগরের

অনুপস্থিতিতে তার স্যুটকেস খোলা হয়েছে এবং তার মধ্যে পাওয়া গেছে আড়াইটে টাকা। এ টাকা যে অপহৃত পাঁচ টাকারই ভগ্নাংশ, বাকী টাকা উড়েছে ফূর্ত্তিতে, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। নইলে হা-ঘরে ছেলে আড়াই টাকার মুখ দেখবে কোত্থেকে। অতএব সাগর চোর।

নিঃশব্দে সাগর তার ছোট ঘরটিতে ঢুকল। ঘর কি সত্যি তার? না—না—না। সাগরের বিক্ষুব্ধ প্রাণ তীব্রকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এ ঘর তার নয়—এ বাড়ী তার নয়—এখানকার কেউ তার নয়। একবার সাগরের ইচ্ছা হ'ল, এই মুহূর্ত্তে এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে দূরে—বহুদূরে। কিন্তু বাবা? পশুপতিবাবু? বাবাও কি সত্যি তার কেউ নয়? অসহায় আবেগে সাগর বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। বুকের ভিতরে ঝড় উঠে বুঝি। দু'চোখে অবিরল বর্ষণ। একি করলে ভগবান—শেষে চোর অপবাদ!

রাত্রেও সাগর কিছু খেল না। দরজায় খিল লাগিয়ে অন্ধকার ঘরে উপুড় হয়ে প'ড়ে রইল। কেউ কেউ খেতে ডাকল, কেউ বা করল শাসন। নির্ব্বিকার সাগর বিছানা ছেড়ে উঠল না—নীরবে শুয়ে রইল।

শেষ রাতের ট্রেনে পশুপতিবাবু ফিরে এলেন। অনাহার-ক্লান্ত সাগর তখন নিদ্রাচ্ছন্ন। মেঝ ভাই ডালপালা লাগিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অবিলম্বে তাঁর কানে দিলেন এবং জানিয়ে-

দিলেন যে, এসব হা-ঘরে চোর-বদমাসের সঙ্গে তা'রা ছেলেপিলে নিয়ে থাকতে পারবেন না। এতে কপালে যা থাকে তাই হবে।"

পশুপতিবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আহত পিতৃ-হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে উঠল এ ভয়ঙ্কর আঘাতে। একি করলে ভগবান—শেষে চোরের পিতৃত্ব।

পকেটে হাত দিয়ে বের করলেন একটি সুন্দর আড়বাঁশী—ফুল-লতা কাটা। সাগর বাঁশী বাজাতে বড় ভালবাসে।

এক মোচড়েই বাঁশীটি ভেঙে দুইখান হয়ে গেল। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ঘরের ওপারে। পশুপতিবাবুর চোখে তখন ধ্বংসের আগুন জ্বলছে। ব্যর্থশিকার সিংহের মত পশুপতিবাবু দাঁড়ালেন এসে সাগরের ঘরের সাম্‌নে; ডাকলেন—"সাগর—সাগর, দরজা খোল।"

ধড়মড়িয়ে উঠে সাগর দরজা খুলে দিলে। শুধাল ব্যগ্রকণ্ঠে—"কখন এসেছেন আপনি ?"

—"তোমার বিরুদ্ধে চুরির চার্জ্জ, তুমি জান ?"

—"হ্যাঁ।"

—"কি তুমি বলতে চাও এ সম্পর্কে ?"

—"আপনার কি মনে হয় ?"

পশুপতিবাবু জ্বলে' উঠলেন—"আমার কি মনে হয় না হয় সে-কথা থাক। তোমার কি বক্তব্য তাই বল। বল এসব সত্যি কিনা ?"

এখানেও সন্দেহ? পুত্র হ'তে যে প্রিয়তর, সামান্য পাঁচটা টাকার জন্যে তার উপরেও অবিশ্বাস? তবে কি সবই মুখোস? হ্যাঁ, তাই। নইলে পশুপতিবাবু তো দৃঢ়কণ্ঠে এ অভিযোগকে মিথ্যা ব'লেই উড়িয়ে দিতেন। তারপর অভিযোগমুক্ত পুত্রের মুখে শুনতে পারতেন প্রকৃত কাহিনী। তা তো তিনি করেন নি। বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসটাই তাঁর চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সবই মুখোস—সব শেষ।

তীব্র অভিমানে সাগর বিবেচনার সাগরে খেই হারিয়ে ফেলল। পিতৃতুল্য পশুপতিবাবুর এই অবিশ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃত কাহিনী ব'লে বিচারে খালাস পাবার রুচি তার হ'ল না। অথচ তা হ'লে কত সহজেই সব মিটে যেত। কত অনায়াসেই সাগর বলতে পারত প্রকৃত কথা।

......থার্ড ক্লাস থেকে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েই সাগর কয়েকখানি পুরাণো অকেজো বই বিক্রি করেছিল—আর একটি ছেলেকে ; পেল গোটা আড়াই টাকা। কাউকে না জানিয়ে টাকাটা সে রেখে দিল তার রংচটা টিনের স্যুটকেসটায়। কয়েক মাস পরেই তো চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা। সার্কাস আসবে, বায়স্কোপ আসবে, আসবে কত রকমের জিনিসপত্র। সে সময় আড়াইটে টাকা হাতে থাকলে কী মজাই না হবে। এই সব ভবিষ্যৎ আনন্দের স্বপ্নে বিভোর হয়েই সাগর টাকাটা রেখে দিল লুকিয়ে। কেউ জানে না—পশুপতিবাবুও না।

এই কথাটা বললেই বুঝি ঠিক হ'ত; কিন্তু ব্যবহারিক জগতে যা ঠিক, ভাবের জগতে তা অচল। সাগর কিশোর স্বপ্নময়, ভাবুক। আসামী সে নয়। ধীর সহজ গলায় সে বলল—"হ্যাঁ, সব সত্যি।"

"সত্যি?"—পশুপতিবাবু বিস্মিত-বেদনায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন। একটু পরে ঝাঁঝালো গলায় বললেন—"আমারই ভুল হয়েছিল। বিধাতার ইচ্ছায় আমি অপুত্রক। তাই আমি থাকব। তোমার সঙ্গে আর আমার পিতা-পুত্র সম্পর্ক রইল না। চোরের বাবা আমি নই, হ'তে পারি না।"

আরও একটু পরে পশুপতিবাবু বললেন—"তবে হ্যাঁ, তার জন্যে একথা মনে ক'রো না যে, এখানে তোমার আশ্রয়ের অভাব হবে। আমি যতদিন উপার্জ্জনক্ষম থাকব, এ বাড়ীর দরজা তোমার সামনে কেউ বন্ধ করতে পারবে না।"

সাগর ভিজে গলায় বলল—"আপনার অনুগ্রহই আমার পরম ভাগ্য।"

পশুপতিবাবুর পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে সাগর প্রণাম করল গভীর আবেগে। তারপর দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল। পশুপতিবাবুর ভিজে চোখের সাম্‌নে আকাশ হ'তে একটি তারা ছিটকে গেল অসীম কালো অন্ধকারে।

পরদিন হ'তেই সাগর নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

—"তা হ'লে মহারাজ শত্রুজিতের পক্ষ তুমি ত্যাগ করবে ?"

—"হ্যাঁ বাবা, শুধু তোমার অনুমতি পেলেই।"

—"আমার অনুমতি ? কিন্তু আমি ত মহারাজকে ত্যাগ করতে পারব না, তরুণ !"

—"কেন বাবা ?"

—"বিদেশীর আক্রমণ থেকে মহারাজ শত্রুজিতই একদিন আমাদের বাঁচিয়েছিলেন।"

—"মহারাজ শত্রুজিতের সিংহাসন রক্ষা করতে বীরনগরের সন্তানদলও তাদের বুকের রক্ত কম ঢালে নি, বাবা!"

খানিক চুপ ক'রে থেকে রঘুপতি সর্দ্দার বলল—"তবে আজই বা তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চাও কেন?"

তরুণ দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিল—"আমাদের স্বাতন্ত্র্য—আমাদের স্বাধীনতা আমরা ফিরে পেতে চাই। বিদেশী যেদিন দেশ আক্রমণ করেছিল, সবাই সেদিন হাত মিলিয়েছিলাম। মহারাজ শত্রুজিত শক্তিমান্, বিপুল তাঁর সৈন্যবল। তাই মেনে নিয়েছিলাম তাঁর নেতৃত্ব।—বিদেশী পরাভূত হয়েছে। দেশ আজ বিপদ-মুক্ত। আর কেন সহ্য করব তাঁর প্রভুত্ব?"

—"প্রভুত্ব?"

—"হ্যাঁ বাবা, প্রভুত্ব। মহারাজ শত্রুজিতের নেতৃত্ব আজ প্রভুত্বে এসে দাঁড়িয়েছে। বিপদের দিনে সকলে মিলে যে হুকুমের ক্ষমতা তাঁকে দিয়েছিলাম, আজ তিনি জোর ক'রে সেই হুকুম চালাতে চাইছেন।"

রঘুপতি সর্দ্দারের সমস্ত শরীর একবার কেঁপে উঠল। চোখ দুটি জ্বলে' উঠল তীব্র আক্রোশে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য—তারপর ধীর-গলায় সে শুধাল—"এর কোন প্রমাণ পেয়েছ তোমরা?"

—"প্রমাণ! সবই ত তুমি জান বাবা। আমাদের বিদ্যাপীঠে মহারাজের বংশ-পরিচয় পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে।

সীমান্ত অতিক্রম করতে হ'লে মহারাজের অনুমতি নিতে হবে। মহারাজের সাথে দেখা করতে হ'লে দিতে হবে নজরানা। কই—এসব নিয়ম আগে ত ছিল না বাবা!"

রঘুপতি সর্দ্দার মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"বেশ, আমি প্রাণ খুলে অনুমতি দিলাম—বীরনগরের স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রসর হও।"

তরুণের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তবু সঙ্কোচ-জড়িত কণ্ঠে শুধাল—"কিন্তু তুমি—"

—"আমি ত তোমাদের দলে যোগ দিতে পারব না।"

—"কেন বাবা?"

—"কেন?"—রঘুপতি সর্দ্দারের ঠোঁটে করুণ হাসি—মেঘান্ধকার আকাশের নিরালা তারার মত। ধীরে ধীরে আসন হ'তে উঠে রঘুপতি পাশের ঘরে চ'লে গেল। তরুণ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল তার স্থির পদক্ষেপের দিকে।···

রঘুপতি ফিরে এল। তার হাতে একখানি লম্বা ভুর্জ্জপত্র গোল ক'রে মোড়া। কোন কথা না ব'লে রঘুপতি ভুর্জ্জ-পত্রখানি মেলে ধরল তরুণের চোখের সাম্‌নে।

তরুণ বিস্মিত চোখে সেখানি পড়ল। সেখানি বিদেশীর হাত হ'তে বীরনগরকে রক্ষার বিনিময়ে মহারাজ শত্রুজিতের প্রতি আজীবন সসম্মান আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি-পত্র। নীচে রয়েছে রঘুপতি সর্দ্দারের স্বাক্ষর।

তরুণ চেঁচিয়ে উঠল—"এ তুমি কি করেছ বাবা, এ যে দাসখত!"

ধীর-গলায় জবাব এল—"আজ দেখছি তাই। কিন্তু সেদিন ভেবেছিলাম, এ প্রতিশ্রুতি-পত্র বন্ধুত্বের অনুরাগ-লিপি।"

অবরুদ্ধ ক্রোধে রঘুপতি সর্দ্দারের গলার স্বর কাঁপছে—সুড়ঙ্গপথে বাধা-পাওয়া পাগলা হাওয়া যেন।

তরুণ শুধাল—"তা' হ'লে উপায়?"

—"স্বাক্ষর যখন করেছি, তা পালন করতেই হবে।"

—"দেশের বিরুদ্ধে—আমাদের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াবে?"

—"হ্যাঁ, কর্ত্তব্যের তাই নির্দ্দেশ। শুধু আমি কেন,

বীরনগরের অনেক সামন্ত সর্দ্দারের এই অবস্থা। কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশে তা'রা দেশদ্রোহী।"

—"বাবা—" কি যেন বলতে যেয়ে তরুণকুমার থেমে গেল। তার মুখ ফ্যাকাসে ; চোখে জল। বুকে ঝড়ের আঘাত।

রঘুপতি সর্দ্দার সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—"নিঃসঙ্কোচে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়। সমগ্র বীর-নগরের আশীর্ব্বাদ রইল তোমার মাথায়। একা বাবার বিরোধিতায় তোমার কিসের ভয় !"

তরুণ নূতন উৎসাহে ব'লে উঠল—"তবে আর কোন ভয় নেই বাবা। তুমিই ত শিখিয়েছ—'পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা'।"

তরুণ বাবার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে প্রণাম করল। পদধূলি নিল দুই হাতে ; মাথাল মাথায়, মুখে ও বুকে।

রঘুপতি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে বলল—"জীবনে সর্ব্বদা মনে রেখ তরুণ, কর্ত্তব্য সকলের উপরে।"

সুরু হ'ল সংগ্রাম। একদিকে মহারাজ শত্রুজিতের বিরাট বাহিনী। অন্যদিকে ক্ষুদ্র বীরনগরবাসী সৈন্যদল ; কিন্তু ক্ষুদ্র হ'লেও তা'রা রণকুশল, বিশেষতঃ গরিলা-যুদ্ধে অদ্বিতীয়। সম্মুখ-সমরে তা'রা তুচ্ছ—নগণ্য ; কিন্তু তাদের আকস্মিক আক্রমণ ও অন্তরাল-সমরে শত্রুজিতের বিরাট বাহিনী বিপর্য্যস্ত।

এমনি ক'রে চলল সংগ্রাম।

পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়—শিখরের পর শিখর তুলে দাঁড়িয়ে আছে শতস্কন্ধ রাবণের মত। বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে আছে গিরিবর্ত্ম—সঙ্কীর্ণ পথ। দুই পাশে আকাশ-ছোঁয়া পাথরের দেয়াল। মাঝখানে সরুপথ। তরবারির আঘাতে পাহাড়কে কে যেন মাঝে মাঝে খণ্ডিত ক'রে রেখেছে।

পাঠক, তেমনি এক গিরিবর্ত্ম ধ'রে চল এগিয়ে। কোন ভয় নেই, আমি আছি সাথে। দু'পাশে পাথর-প্রহরী। উপরে পাথরের ত্রিশূল। আকাশ চোখে পড়ে কি পড়ে না। চারদিকে কেমন একটা ভাপসা গন্ধ। তাতে ভয় পেও না। আমি সাথে রয়েছি যে।

এই ত গিরিবর্ত্ম শেষ হ'ল। সাম্‌নে খানিকটা সমতল জায়গা। চারপাশের পাহাড়ের গায়ে গায়ে বেড়ে উঠে গাছগাছালীর ছায়ায় ঘেরা শান্তিকুঞ্জ যেন। চুপ। চেঁচিয়ে কথা ব'লো না। দেখছ না—বীরনগর-বাহিনী কেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। কথা বলছে ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে—চলছে পা টিপে টিপে; আর মাঝে মাঝে চাইছে আকাশপথে!

চেয়ে দেখ, ওই শিখরের মাথায় কে এক ঘোড়সওয়ার। ভাল ক'রে দেখ—সে তরুণকুমার। ওই শিখর-শিরে সে প্রহরী। গুরুদায়িত্ব তার শিরে। পাহাড়ের ওপাড়ে

মহারাজ শক্রজিতের সেনাদল শিবির পেতেছে। তাদেরই গতিবিধির উপর রয়েছে তরুণকুমারের লক্ষ্য। তার ইঙ্গিত পেলেই বীরনগর-বাহিনী অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে শক্রজিতের শিবিরে। তাই তা'রা ওৎ পেতে আছে পাহাড়ের বুকে।

কিন্তু মহারাজ শক্রজিতের সেনাদল যদি একবার ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে, বিদ্রোহী বীরনগরীরা হাতের মুঠোর তলে আত্মগোপন ক'রে আছে তীক্ষ্ণ ছুরি নিয়ে, তা হ'লে আর রক্ষা নেই। মাত্র কয়েক দণ্ডের আক্রমণেই বীরনগরের বীর-বাহিনীকে পাহাড়ের বুকেই শেষশয্যা পাততে হবে। পাহাড়ের গর্ত্ত হ'তে একটি প্রাণীও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। তাই বলছি—চুপ। চেঁচিয়ে কথা ব'লো না।

তরুণকুমার দাঁড়িয়ে আছে একটি ঝোপের আড়ালে। কোমরে তরোয়াল, হাতে ধনুক, আর পিঠে তূণ। ঝোপের আড়াল হ'তে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে শক্রজিতের শিবিরের দিকে।

সহসা ডাইনে চোখ ফিরিয়েই তরুণকুমার চম্‌কে উঠল। সাম্‌নের সবচেয়ে উঁচু শিখর-শিরে দাঁড়িয়ে আর এক ঘোড়-সওয়ার—কোমরে তরোয়াল, হাতে ধনুক, পিঠে তূণ। ঘোড়ার সাম্‌নের পা দুটি লাফ দেওয়ার ভঙ্গীতে তোলা। সওয়ারের হাতে দৃঢ়বদ্ধ বল্‌গা। মুখটা ওপাশে ফেরানো। আকাশপটে আঁকা বীর তীরন্দাজের মর্ম্মর-মূর্ত্তি যেন।

তরুণ চকিতে ফিরে দাঁড়াল। কালবিলম্ব না ক'রে ধনুকে দিল টঙ্কার। আজানা তীরন্দাজের মৃত্যু আসন্ন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অজানা ঘোড়সওয়ার মুখ ফেরাল। তরুণের বুক উঠল কেঁপে। হাতের তীর মাটিতে প'ড়ে গেল। এ স্বপ্ন, না সত্য! তরুণ ভাল ক'রে চোখ রগড়ে আবার তাকাল। ঘোড়সওয়ার তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে। উদ্বেগ নেই, উৎকণ্ঠা নেই; শান্ত—স্থির—আকাশের বন্দনারত।

তরুণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথায় নানা চিন্তার সংঘাত। হয়ত ঘোড়সওয়ারের মনে কোন অভিসন্ধি নেই—নিস্তব্ধ নৈশাকাশের মহনীয় সৌন্দর্য্যই তাকে টেনে এনেছে শিখর-শিরে।

কিন্তু এ ধারণা যদি মিথ্যা হয়। ঘোড়সওয়ার যদি বীরনগরীদের সন্ধানে এসে থাকে। যদি সে মহারাজ শত্রুজিতের প্রহরী হয়। সব খবর জেনে এখনই যদি সে শিবিরে সংবাদ দেয়। তা হ'লে—

তরুণের একটি শর সন্ধানের উপর যে সহস্র বীরনগরীর প্রাণ—তাদের 'প্রাণৈরপি প্রিয়' স্বাধীনতা নির্ভর করছে। তবে—প্রাণের অনুরোধে সে কি কর্ত্তব্যের শাসন ভুলে যাবে। তরুণের কানে বেজে উঠল বাবার আশীর্ব্বাণী—কর্ত্তব্য সকলের উপরে।

তরুণের শিথিল হাত দৃঢ়তর হ'ল। ধনুকে আকণ্ঠ গুণ

টেনে কৌশলী হাতে সে শরক্ষেপ করল। রাতের স্তব্ধ বাতাস কেটে খান-খান হয়ে গেল সে শরের আঘাতে।

এদিকে বহুক্ষণ তরুণের কোন সংবাদ না পেয়ে বীরনগর-বাহিনীর সেনাপতি শেখরেশ্বর একজন অনুচরকে পাঠিয়েছিল তার সন্ধানে। বন্ধুর পার্ব্বত্যপথ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে সহসা সে দেখল—শিখর-শিরে এক ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে; নিশ্চল স্তব্ধ মূর্ত্তি—পাথরে গড়া যেন। বিস্মিত হয়ে সে খানিকক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল। মূর্ত্তি স্থির অকম্পিত। তার মনে সন্দেহ হ'ল—নিশ্চয় এ শত্রুর গুপ্তচর। তাড়াতাড়ি সে ছুটল তরুণকুমারকে সংবাদ দিতে।

পাহাড়ের একটা মোড় ঘুরে এসেই সে দেখে বিস্ময়কর ব্যাপার! পর্ব্বত-শিখর জনশূন্য। এক বেপরোয়া অশ্বারোহী তীব্রগতিতে শূন্যপথে নেমে চলেছে নীচে। এও কি সম্ভব? পৃথিবীর আশ্রয় ছেড়ে শূন্যপথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে কে এই অলৌকিক ঘোড়সওয়ার?

উৎকণ্ঠিত চিত্তে অনুচর ছুটে গেল তরুণকুমারের 'কাছে। সেখানে আর এক বিস্ময়। কর্ত্তব্যপরায়ণ বীর প্রহরী তরুণকুমার পাহাড়ের উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে তার অসহ্য কান্নার আঘাতে।

অনুচর ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বলল—"দুঃসংবাদ আছে তরুণ-কুমার!"

চমকে ফিরে তাকিয়ে আবার মুখ গুঁজে তরুণ বলল—"জানি।"

—"আকাশপথে ছুটে চলেছে এক অলৌকিক ঘোড়সওয়ার—সম্ভবতঃ শত্রুর চর!"

—"জানি। আমার তীরের আঘাতে শিখরচ্যুত হয়েই সে কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাবীর ছুটে গেছে মৃত্যুর পথে।"

—"সে কি? আপনি তার পরিচয় জানেন?"

তরুণকুমার বিবর্ণ মুখখানি তুলে বলল—"জানি, সেই বীর আমার বাবা।"

জীবনের পথে চলতে চলতে এমন অনেক অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় ঘটে, যাকে যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, অথচ মনের নিবিড় বিশ্বাস সেখানে এত শক্তিমান যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ আঘাত তাকে একটুও নড়াতে পারে না।

অনেক দিন আগেকার কথা। নূতন কলেজী জীবন—স্বপ্নময় প্রভাত-আকাশের মত দীপ্তিময়। গ্রাম হ'তে আট মাইল দূরে সহর। সেখানের সস্তা হোটেলে থেকেই

পড়াশুনা চলে। আর চলে রবিবারের অলস মধ্যাহ্নের সুযোগে প্রতি শনিবারে বাড়ী যাওয়া যশোর রাস্তা বেয়ে।

শ্রাবণের এক শনিবার। কলেজ হ'তে হোটেলে ফিরলাম ভিজতে ভিজতে। সকাল হ'তেই জল ঝরছে অবিরাম। বাড়ী যাবার কথায় যশোর রাস্তার কর্দ্দমাক্ত দুর্দ্দশার কথাই মনে হ'তে লাগল। তবু বাড়ী যেতেই হবে। নইলে রবিবার হবে অসহ্য। তা ছাড়া, আজ রাতে হবে গাঁয়ের সখের যাত্রাদলের পালা ও অভিনেতা নির্ব্বাচন। সবাই সেখানে আমাকে দেয় বিজ্ঞ রসবেত্তার আসন। না গেলে যে আমার চলবেই না।

দিন ক্রমেই আঁধার হয়ে এল। মন উঠল চঞ্চল হয়ে। ভাঙা কাঠের পুল ছেড়েই বুড়ো তেঁতুলগাছকে বাঁয়ে ফেলে আঁধার জঙলাঢাকা গলি বেয়ে একটু এগিয়ে গেলেই ছোট্ট মণ্ডপঘর—সখের যাত্রার আড্ডাখানা। সেখানে ভিড় জমিয়েছে শিশু যুবক বৃদ্ধ। কল্‌কে ও বিড়ি পুড়ছে। সিরাজদ্দোল্লাই হাকডাকের অন্ত নেই।

—এমনি অনেক পরিচিত ছবি ও পরিচিত প্রাণের সঙ্গলাভের আশায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাই কাপড় মালকোচা এঁটে ছাতি কাঁধে ফেলে নামলাম পথে।

নাটক ও অভিনেতা নির্ব্বাচনপর্ব্ব শেষ হয়ে গেল আমারই সর্দ্দারীতে। 'সুরথ-উদ্ধার' নাটকের মত বই

সেকালে আবার ছিল নাকি? ভাষায় চরিত্রে নীতি-শিক্ষায় ধর্ম্মশিক্ষায় 'সুরথ-উদ্ধার' অভিনব।

যাত্রার রিহার্সেল চলল পুরা দমে। আমাদের শরণকে দেওয়া হ'ল ছোটরাজপুত্র সুধীরের ভূমিকা। । অ্যাক্‌টো আর গানে ও যে এবার লোকের চোখে সুরধুনী বইয়ে দেবে, তা অনিবার্য্য। কী দরদ ওর গলায়, আর কী করুণতা ওর প্রতিটি উচ্চারণে।

যাত্রাদলের পাণ্ডা তারিণীদা একদিন আমায় বলল—"কি বাছাই যে দিয়েছ বাবুজি, একেবারে চমৎকার। প্রত্যেকটি পার্ট যেন জলের মত উতরে যাচ্ছে। আর ওই আমাদের শরণ। কোথায় লাগে নট্টের সেই বাবুরি-চুলো ছোঁড়া, আর কোথায়ই বা লাগে ঘোষালের মেডেল-পাওয়া কালো ছেলে!"

সগর্ব্বে হেসে আমি জবাব দিলাম—"বাইরে গেলে মেডেলের মালা শরণের গলায়ও ঝুলত দাদা। কিন্তু তা তো ও যাবে না, ওর মা কিছুতেই ওকে যেতে দেবে না—"

পরের সপ্তাহের শনিবার। পুরঞ্জয় সিংহের রিহার্সেল চলেছে। রাজা সুরথ পরম-বিশ্বাসী সেনাপতিকে অন্যায় সন্দেহে তিরস্কার করছে, আর সত্যনিষ্ঠ পুরঞ্জয়ের নির্ভীক তেজস্বী উত্তর সকলকে দিচ্ছে চম্‌কে।

বাইরে একটানা আঁধার। স্তব্ধ রাতের বুকে শুধু

ঝিঁঝি ডাকছে। সবাই বিমুগ্ধ চঞ্চল। এমন সময় এল শরণ। রোজকার চপল ছেলে আজ যেন বিমর্ষ। শুধালাম—"কার সাথে এলিরে এই আঁধারে ?"

শরণ জবাব দিল—"কার সাথে আবার, একাই।"

—"ভয় করে না তোর ?"

—"উঁহু। তবে ওই তেঁতুলগাছটার তলে এলে গা-টা কেমন ছম্‌ছম্‌ করে—এই যা।"

শরণ একপাশে ব'সে পড়ল। সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহ শ্রান্ত হয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল রাজা সুরথের বিড়ির আগুনে।

আমি বললাম—"এইবার তোর পালা শরণ, দাঁড়া।"

রোজ যে ছেলে বলবার আগে গান ধ'রে দেয়, আজ তার উঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আর একবার তাগিদ দিতেই কাঁদো-কাঁদো স্বরে শরণ বলল—"সুধীরের পার্ট আমি করতে পারব না, নারাণদা।"

বিস্মিত হয়ে শুধালাম—"কেনরে ? কি হয়েছে ?"

—"মা বারণ করেছে। ও পার্ট করলে নাকি খারাপ হয়।"

—"কি খারাপ হয় ?"

—"ওই যে মা-কালীর সাম্‌নে কাঠগড়ায় পড়তে হয়, ও নাকি ভাল না।"

বিরক্ত হয়ে বললাম—"তোর মা জানল কি ক'রে যে, এসব তোর করতে হবে ?"

—"বারে, আজ যে খেতে খেতে পার্ট মুখস্থ করছিলাম, আর সব বুঝিয়ে বলছিলাম মাকে।"

বড় রাগ হ'ল ছেলেটার অতি-বাহাতুরীতে। বললাম—"হুঃ, বোকারাম কোথাকার! আবার নবাবী ফলাতে সব বলতে গেছিস্ মাকে। যা, তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।"

শরণ বলল—"সুধীরের পার্টটা করতে আমার কি আর কম ইচ্ছা নারাণদা। কিন্তু কি করব, মা যে মানা করল।"

যাত্রার ভবিষ্যতের পক্ষে এই অশুভ সংবাদ শুনে আসর সেদিন ভেঙে গেল। তামাক টানতে টানতে তারিণীদা বলল—"তাই তো হে বড় বিপদই হ'ল। যে একগুঁয়ে ওর মা, আর ওই তো সবেধন নীলমণি! কি যে হবে।"

রাগ ও হতাশা আমার মনে তখন কলরব তুলেছে। কি যে সব কুসংস্কার পাড়াগেঁয়ে মানুষের। এ তো আর সত্যিকারের কালী নয়, আর সত্যিকারের বলিও নয়। যাত্রা তো একটা সাজানো ব্যাপার। তার আবার ভাল আর মন্দ! কিন্তু সেকথা শুনছে কে? অথচ এই শরণ ছাড়া সুধীরের পার্ট অন্য কাউকে দিয়ে তো হ'তেই পারে না। আর কেউ ওর মত টান দিয়ে গাইতেই পারবে না—

'দাদাগো—

কেবা কার পর কে কার আপন।
কাল-শয্যা পরে
মোহ-তন্দ্রা ঘোরে
দেখে পরস্পরে
অসার আশার স্বপন।
দাদাগো'—

শরণ কথা বলল—"আচ্ছা নারাণদা, মা তো তোমার কথায় খুব বিশ্বাস করে। তুমি কেন মাকে একবার বলো না যে, এতে কোন দোষ নেই। তবেই তো পার্টটা আমি করতে পারি। উঃ, কী মজাই যে আমার লাগে এ-পার্টটা করতে।"

ব'লেই শরণ নীচু গলায় গেয়ে উঠল—

"এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে।"

যা হোক—অনেক কষ্টে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক জ্ঞানগর্ভ

বক্তৃতা দিয়ে শরণের মাকে রাজী করালাম। যাত্রার রিহার্সেল আবার পুরাদমেই চলল।

সপ্তমী পূজার রাতে বড় আঙিনায় গান বেশ জমে' উঠেছে। সব লোক হা ক'রে শুধু শুনছে আর দেখছে। অনেকেরই চোখের কোণ চক্‌চক্ করছে। চাদরের কোণ দিয়ে কেউ বার বার চোখ মুছছে। মাঝে মাঝে ভাবুক শ্রোতারা বলছে—"বাঃ—বাঃ—"

এতটুকু সময় আমার নেই। সাজ-পোষাক দেখা, সময়মত সবাইকে আসরে ঢুকিয়ে দেওয়া, কত যে কাজ আমার। তবু মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে সুধীরের অ্যাক্‌টো শুনে আসছি।

সাজ-ঘরে কি কাজে খুব ব্যস্ত আছি। হঠাৎ আসরের দিক হ'তে একটা গণ্ডগোল শুনে দৌড়ে গেলাম। মেয়েদের বসবার জায়গায় তখন ভিড় জমেছে। তাড়াতাড়ি ক'রে এগিয়ে গেলাম।

শরণের মা এসেছিল যাত্রা শুনতে। বনবাসের দৃশ্যের পর হ'তেই তার কান্না সুরু হয়েছে। কিন্তু এবারে মায়ের প্রাণ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠেছে। আসরে চলেছে সর্ব্বনাশা বলির দৃশ্য। হাত-পা-বাঁধা সুধীরকে মা-কালীর সাম্‌নে হাঁড়িকাঠে ফেলে নারকী মন্ত্রী যেমন খড়্গ তুলেছে, অম্‌নি শরণের মা চীৎকার ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

আসরের দিকে চেয়ে দেখলাম—বাঁধনমুক্ত সুধীর তখন ব্যথাতুর মুখে মায়ের কান্নার দিকেই কান পেতে আছে।

সেবা-যত্নে জ্ঞান ফিরিয়ে ওর মাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। যাবার সময় সে আমার হাত ধ'রে শুধালে ধীরকণ্ঠে—"বাবা, শরণ আমার ভাল আছে তো?"

হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় দিলাম। মন কেমন দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। সাজ-ঘরে যেয়ে একপাশে একটা পোষাকের বাক্সের উপর ব'সে রইলাম।

পরদিন সকালে মায়ের ভীত-ডাকে যখন ঘুম ভাঙল, বেলা তখন অনেক হয়ে গেছে। রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। শরতের সোনার সকাল।

মা বললেন—"ওরে নারাণ, ও-পাড়া হ'তে কিসের যেন সোর উঠেছে।"

গণ্ডগোল লক্ষ্য ক'রে এক দৌড়ে উঠলাম গিয়ে শরণদের বাড়ী। দেখি—শরণ দাওয়ায় শুয়ে আছে সংজ্ঞাহীন হয়ে; ওর শরীর বেঁকে গেছে ধনুকের মত। সমস্ত দেহ বিবর্ণ, নীলাভ।

আমাকে দেখে শরণের মা হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—"দেখরে বাবা, শরণের আমার কি হ'ল।"

বিমূঢ়ের মত শুধালাম—"কি হয়েছিল মাসি?"

—"কিছুই তো হয় নি বাবা। কাল সন্ধ্যের আগে বড়বাড়ী থেকে পূজার প্রসাদ দিয়ে গেল। তা শরণের তো

টিকিও দেখলাম না কাল। আজ সকালে উঠেই বলল, খিদে পেয়েছে। প্রসাদের কলাটা আর দু'খান নারকেল হাতে দিয়ে আমি ঘরে এলাম খাবার দিতে। হঠাৎ বাবা আমার কেমন

চিক্‌কুর দিয়ে মাটিতে প'ড়ে গোঙাতে লাগল। ওরে বাবারে-অ্যাকুটো ক'রে শরণ আমার চ'লে গেলরে বাবা—"

ওর মা চীৎকার ক'রে গলা ভাঙল; মাটিতে প'ড়ে মাথা কুটল। আমরা যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করলাম, ডাক্তার ডাকলাম। সকলে ওর ছোট দেহখানি ধ'রে ব'সে রইলাম। কিন্তু শরণকে ধ'রে রাখতে পারলাম না। ধনুষ্টঙ্কারের নিষ্ঠুর আক্রমণে সোনার ছেলে নীল হয়ে ঢ'লে পড়ল।

গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই সকাল-সাঁঝে ঘোষণা জানাল— "দু'পাতা ইংরেজী প'ড়েই ধরাকে সরা জ্ঞান করো। আরে বাবা, ধর্ম্মের নামে কি ছেলেখেলা সয়? মায়ের জিনিস মা নিয়ে গেলেন—"

আমরা তো জানি, জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের জানিয়েছে, ধনুষ্টঙ্কার রোগে শরণের হঠাৎ-মৃত্যু স্বাভাবিক নৈসর্গিক ঘটনা। এর মধ্যে দেব-রোষের ছায়ামাত্র নেই। ওসব ভ্রান্ত ধারণা, অশিক্ষিত মনের অন্ধ কুসংস্কার। কিন্তু শরণের মাকে তা বুঝাব কোন্ যুক্তি দিয়ে। ... ...

আজও আছে সখের যাত্রাদল। প্রতি বছর শ্রাবণ-সন্ধ্যায় নাটক-নির্ব্বাচন আজও চলে। কিন্তু প্রকাশ্য আসরে দেবদেবীর সাম্‌নে বলিদান বা হত্যা যে-সব নাটকে আছে, আমাদের গাঁ হ'তে তা চির-বর্জ্জিত। গান গাইতে এসে কোন্ সোনার শরণ আবার কাঁদাবে তার অভাগিনী মাকে কে জানে। তাই এ নিয়ম।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বাড়ীটার দিকে চেয়ে নির্ভয়ের গা-টা ছমছম্ ক'রে উঠল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের প্রকাণ্ড বাড়ী। মস্তবড় কাঠের দরজায় আগাগোড়া লোহার পাত দিয়ে খোপ্ কাটা। প্রত্যেক খোপে খোপে লোহার গজাল পিটিয়ে বসানো। দরজার দুই পাল্লায় বড় বড় দুটি ঢাল ঝোলানো। তাতে পিতলের পাত দিয়ে টানা টানা চোখ আঁকা।

বাড়ীটার নানা স্থানে ভাঙা। চুনকাম ধুয়ে মুছে গেছে। কোথাও ইটগুলো খুলে পড়ায় দেয়ালটা দাঁত বের করেছে। কোথাও বা দালানের খিলান পড়েছে ভেঙে। ছোট ছোট গাছ ও আগাছা লতায় বাড়ীটাকে ঘিরে ধরেছে।

চৌদ্দ মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে ভরসন্ধ্যায় এ-বাড়ীর সাম্‌নে এসে একলা দাঁড়ালে গা শির্‌-শির্‌ করা অস্বাভাবিকও নয়, অন্যায়ও নয়। কিন্তু ভয় পাবার ছেলে নির্ভয় নয়। বয়েস এগারো বছর হ'লেও মনে তার একুশ বছরের সাহস। তা' ছাড়া ভয় পেলে তো তার চলবে না। এ সংসারে সে যে বড় একা—বড় অসহায়। তিনমাস আগে একই রাতে বাবা ও মা মারা গেছেন কলেরায়। তারপর হ'তে প্রতিবেশীদের দয়া-দাক্ষিণ্যই ছিল তার একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু সে আর কতদিন? শীগ্‌গিরই তাকে আশ্রয় নিতে হ'ত সহরের পথে, নয় তো অনাথ-আশ্রমে। ভাগ্যিস্‌ এমনি সময়েই পেয়ে গেল কাকার চিঠি।

নির্ভয়ের মনে পড়ল কাকার কথা। অদ্ভুত লোক। আপন কাকা, অথচ নির্ভয় আজ অবধি তাকে চোখে দেখে নি। বাবার কাছে মাঝে মাঝে গল্প শুনেছে। নাম শ্রীনিশাকর নন্দী। উঁচু লম্বা ফর্সা চেহারা। প্রশস্ত ললাটে রক্ত-চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক-রেখা; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দর্শনশাস্ত্রে এম্‌-এ পাশ করেছেন। অথচ চাকরী-বাকরী কিছুই করলেন না।

হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, সহরের সম্পত্তির অর্দ্ধেক বিক্রি ক'রে দিয়ে নির্জ্জন পাড়াগাঁয়ে এই অর্দ্ধ-ভগ্ন বাড়ীটা কিনে নিলেন অনেক টাকা দিয়ে। তারপর হ'তেই সুরু হ'ল তার নির্জ্জন বাস—রহস্যময় জীবনযাত্রা।

কিন্তু কেন? পথে আসতে আসতে নির্ভয় অনেকবার ভেবেছে—দীর্ঘকাল ধ'রে যে কাকার সঙ্গে তাদের কোন সংশ্রব ছিল না, আজ তিনি হঠাৎ তাকে আদর ক'রে ডেকে পাঠালেন কেন? একি তার প্রতি দয়া? অথবা বিরাগীর প্রাণে জেগেছে সংসারের কামনা?

একটা বিকট শব্দ ক'রে প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে গেল। নির্ভয় বিস্ময়ে চোখ ফিরাল। সেই মূর্ত্তি! প্রশস্ত ললাটে রক্ত-চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরিধানে রক্তাম্বর। হাতে তুলট কাগজের একখানি পুঁথি।

উল্লসিত কণ্ঠে নিশাকরবাবু ব'লে উঠলেন—"আরে এস, নির্ভয় এস। কেমন আছ তুমি? কত বয়স হ'ল তোমার? আর—পথে আসতে তোমার কষ্ট হয় নি তো বেশি?

নির্ভয় প্রণাম ক'রে জবাব দিল—"আজ্ঞে না, আমি বেশ ভালই বোধ করছি।"

—"তা বেশ—বেশ। কিন্তু তোমার বয়স কত হ'ল বাবা?"

আলাপ হ'তে না হ'তেই দু'দু'বার বয়সের প্রশ্ন! প্রশ্নটা

"তা বাবা, তোমার জন্মদিনটা কবে ?"

নির্ভয়ের কানে যেন কেমন লাগল। জবাব দিল—"আজ্ঞে, আসছে জন্মদিনে আমি বারো বছরে পড়ব।"

—"তা বাবা, তোমার জন্মদিনটা কবে? কি বললে— এগারোই আষাঢ়? তা বেশ, তা বেশ। তা' হ'লে আর ন'মাস পরেই তুমি বারোয় পা দেবে, কেমন এই তো?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তা বেশ, তা বেশ। আমি আবার সব কথা ডাইরীতে লিখে রাখি কি না। তা বেশ, বেশ।...ওরে বাঙ্গা, নির্ভয়কে বাড়ীর ভিতরে মাসিমার কাছে নিয়ে যা।"

বাঙ্গা নিশাকরবাবুর চাকর। সরু লিক্‌লিকে চেহারা। নীলাভ চোখছুটো যেন খানিকটা টেনে বের করা। দেখে মনে হয়, এই ভূতুড়ে বাড়ীতে চাকরী করতেই বাঙ্গার জন্ম। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে এ চেহারা একান্ত বেমানান।

—"আসুন খোকাবাবু!"—একমুখ হেসে নীল চোখ ছুটি ঘুরিয়ে বাঙ্গা নির্ভয়কে নিয়ে ভিতরে গেল। ... ...

বেশ আরামেই নির্ভয় আছে। পেট ভ'রে খায়; ঠাকুরমার সঙ্গে গল্প করে; আর সারা বাড়ীটা তন্ন-তন্ন ক'রে ঘুরে বেড়ায়। নিশাকরবাবুর কড়া হুকুমে এ বাড়ীর সিং-দরজা পার হওয়া নির্ভয়ের নিষেধ।

একদিন নির্ভয় পা টিপে টিপে ঢুকল কাকার ষ্টাডি-রুমে। মস্ত বড় হল। চারজন মানুষের সমান উঁচু সিলিং। ঘরের

চারপাশে সারি দিয়ে আলমারী সাজানো, পুঁথিপত্রে ভর্ত্তি। দেয়ালে অদ্ভুত রকমের সব ছবি টাঙ্গানো। কোথাও এক দীর্ঘদেহ কাপালিক, সম্মুখে প্রজ্বলিত হুতাশন। কোন ছবিতে শব-সাধনারত তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর ভয়াল মূর্ত্তি। একটি ছবি বড়ই ভীতিপ্রদ—এক বীভৎস-দর্শন ভীমকায় সন্ন্যাসী দীর্ঘ নখাঘাতে একটি সুদর্শন কিশোর বালকের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ ক'রে উন্মাদ আনন্দে তাই ভক্ষণে রত।

নির্ভয়ের গা কাঁটা দিয়ে উঠল। সভয়ে সে চোখ ফেরাল। ও কি? দেয়ালে আর একখানি ছবি—অজিন-চর্ম্মে আচ্ছাদিত একখানি টেবিলের সাম্নে ব'সে আছেন কাকা, তাঁর ডান হাতে একটি নর-কপাল; পানপাত্র বুঝি!

নির্ভয় আর একমুহূর্ত্তও সে ঘরে দাঁড়াল না। রুদ্ধশ্বাসে সেখান হ'তে বেরিয়ে এল। ঘরের আবদ্ধ বাতাস যেন ওর পিছনে অট্টহাসি হেসে উঠল। ... ...

সেদিন সন্ধ্যায় নির্ভয় শুধাল—"আচ্ছা ঠাকুমা, এই অজ-পাড়াগাঁয় এত বড় বাড়ী কে তৈরী করেছিল? আর তা'রা সব গেলই বা কোথায়?"

ঠাকুরমা জবাব দিলেন—"বাড়ী যারা তৈরী করেছিলেন, তাঁরা কি আর আছেন! কবে ম'রে স্বর্গে গেছেন। আমরা তো ছোটবেলা থেকে এ বাড়ী এমনি দেখছি, খালিই প'ড়ে আছে। তার পরে না কর্ত্তাবাবু এসে বাড়ী কিনে নিলেন।"

নির্ভয় বিস্ময়ের সুরে বলল—"সে কি ? কাকা যে তোমায় মাসি ব'লে ডাকেন ?"

—"ডাকেন সে কর্ত্তাবাবুর অনুগ্রহ। আমি তো তাঁর আশ্রিত।"

—"তুমি তা হ'লে আমার আপন ঠাকুমা নও ?"

ঠাকুরমা নির্ভয়কে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললেন—"না রে পাগল, না। আমি এই গাঁয়েরই মেয়ে—নিরাশ্রয় বিধবা। কর্ত্তাবাবু আসবার পর থেকে এখানেই আছি।"

নির্ভয় তাঁর কোলে মাথা রেখেই বলল আব্দারের সুরে—"তা' হোক, তুমি কিন্তু আমার আপন ঠাকুমাই হ'লে।"

ঠাকুরমার চোখে জল এল ; বললেন—"আচ্ছা রে, আচ্ছা। তাই তো আছি।"

কিছুক্ষণ সব চুপ। বাইরে একটা দম্‌কা হাওয়ার আর্ত্তনাদ। ভয়ে ভয়ে নির্ভয় প্রশ্ন করল—"আচ্ছা ঠাক্‌মা, কাকা লোকটি কেমন? খুব ভাল—না?"

—"ভাল? এমন দয়ালু লোক আমি দেখি নি ভাই। রাস্তাঘাটে অসহায় ছেলেমেয়ে দেখলেই তিনি তাদের নিয়ে আসবেন বাড়ীতে। তোমাকে বলি নি বুঝি সে-সব গল্প?"

ঘাড় দুলিয়ে নির্ভয় বলল—"কই না তো।"

—"তবে শোন। অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন সবে এ বাড়ীতে এসেছি। একদিন সন্ধ্যায় কর্ত্তাবাবু ফুট্‌ফুটে একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে এলেন সাথে। মেয়েটি বেশ। কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ীর মেয়ের মত হয়ে গেল। এখানে ছিলও অনেকদিন—প্রায় মাস তিনেক।"

নির্ভয় বাধা দিল—"কেন? তারপরে কোথায় গেল?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাকুরমা বললেন—"ভগবান জানেন। একদিন সকালে উঠে তাকে পাওয়া গেল না। কর্ত্তাবাবু তো আশেপাশের সমস্ত পুকুরে জাল ফেলালেন। এদিক-ওদিক লোক পাঠালেন ; কিন্তু মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেল না।"

ঠাকুরমা চুপ করলেন। নির্ভয় কৌতূহলী চোখ মেলে নীরবে চেয়ে রইল। ঠাকুরমা বলতে সুরু করলেন—"আবার

একদিন এল একটি ছেলে। বিদেশীয়া তার নাম। হাতে একটি একতারা। কর্ত্তাবাবু কত আগ্রহ ক'রে তাকে ভিতরে আনলেন। কত প্রশ্ন করলেন—বয়েস কত, বাড়ী কোথায়, কে কে আছে। কিন্তু বিদেশীয়াও একদিন উধাও হ'ল।"

নির্ভয় প্রশ্ন করল—"বল কি ?"

ঠাকুরমার দুই চোখে জল ; বললেন—"আর বলি আমার কপাল। ছেলেটা যে কী যাদুই আমাকে করল। আজও সে হতভাগার কথা ভুলতে পারি না।"

—"বিদেশীয়া কি আর কখনও আসে নি ?"

—"না। তার সাধের একতারাটাও নিয়ে গেল না।"

—"কোথায় সেটা ?"

—"আমার শোবার ঘরে মাথার কাছে টানিয়ে রেখেছি।"

—"আমি নিয়ে আসি"—ব'লেই একদৌড়ে নির্ভয় একতারাটা নিয়ে এল। কিন্তু এ যে ছেঁড়া। নির্ভয় অনেক চেষ্টা করল, কিছুতেই একতারা বাজল না।

রাত্রে নির্ভয় স্বপ্ন দেখল—আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

শোবার ঘরের সাম্‌নের টানা [illegible] যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা ছোট কুঠরী আছে। কুঠরীর দরজায় তালা লাগানো। দরজার উপরের দিকটা একসময়ে রঙিন কাঁচ লাগানো ছিল। এখন সে-সব ভেঙে গেছে।

নির্ভয় স্বপ্ন দেখল—কাঁচ-ভাঙা পথে জোৎস্না পড়েছে সেই কুঠরীতে। আর সেখানে প'ড়ে আছে একটি কঙ্কাল। তার মুখে দাঁত-বেরকরা হাসি। দু'খানি হাত বুকের উপর চাপানো। ও কি? হাতদুটি নড়ছে যেন! মুখ হ'তে বেরিয়ে আসছে যেন অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ!

ভীষণ ভয় পেয়ে ফিরতে যেয়েই নির্ভয়ের ঘুম ভেঙে গেল। সাহসে ভর ক'রে নির্ভয় এগিয়ে চলল কুঠরীর দিকে—স্বপ্ন কি সত্য? মিথ্যা স্বপ্ন। কুঠরীতে কয়েকটি ভাঙা তোরঙ্গ ছাড়া কিছুই নেই। নির্ভয় বিছানায় ফিরে গেল।

সকালে উঠেই নির্ভয় ঠাকুরমা ও কাকাকে বলল রাতের স্বপ্ন-কথা। ঠাকুরমা অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কাকার চোখদুটি হয়ে উঠল কৌতূহলে তীক্ষ্ণ। তিনি পর পর নানা প্রশ্ন করলেন নির্ভয়কে; সব টুকে নিলেন ডাইরীর পাতায়। হেসে বললেন—"দেখ বাবা, একটু সাবধানে থেকো। বুঝলে কিনা, অনেক কালের পুরাণো বাড়ী, একটু সাবধানে থেকো।"

হাসতে হাসতে কাকা চ'লে গেলেন। নির্ভয় ও ঠাকুরমা বিমূঢ়ের মত পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। ... ...

আবার রাত। বাইরে হাওয়ার মাতামাতি। বাগানের গাছপালার মাথায় কোন্ অশান্ত দানবের ধ্বংস-নৃত্য। আকাশ মেঘান্ধকার।

শোবার আগে নির্ভয় জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ওর মনে হ'ল—দমকা হাওয়ায় ভেসে চলেছে অশরীরীদের এক সীমাহীন শোভাযাত্রা। গাছপালার মাথায় তাদেরই কাতর পদক্ষেপ। বাতাসে তাদেরই আর্ত্তনাদ।

ঝন্‌ঝন্ শব্দে জানালা বন্ধ ক'রে নির্ভয় শুয়ে পড়ল।

কয়েকদিন পরের কথা। সারাটা দিন নিশাকরবাবু ষ্টাডি-রুমে কাটালেন। বিকালেও বেড়াতে বেরুলেন না। মাঝে মাঝেই শোনা গেল আলমারী খোলার শব্দ। কত বই যেন পড়ছেন সারাদিন ভ'রে। খেতে পর্য্যন্ত গেলেন না। সকালে ষ্টাডি-রুমে ঢুকবার সময়েই ব'লে গেলেন—"আজ আমার উপবাস। কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে। সাবধান।"

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল।

খট্—খট্—খট্—

ষ্টাডি-রুমের দরজা খুলে নিশাকরবাবু বেরিয়ে এলেন নীচে। এলোমেলো চুল। কপালে রক্ত-চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। চোখে সাফল্যের প্রত্যাশা। ঠোঁটে আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা। পরণে রক্তাম্বর। পায়ে হাড়ের খড়ম।

খট্—খট্—খট্—

নীচের পড়ার ঘরে নির্ভয় চম্‌কে ফিরে তাকাল। দেখল কাকা ঠোঁটের উপর তর্জ্জনী তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। ইসারায়

তাকে বসতে ব'লে নিশাকরবাবু একখানি চেয়ার টেনে নিলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—"বাবা নির্ভয়, আজ রাত এগারোটার সময় ষ্টাডি-রুমে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

রাত এগারোটায়! ষ্টাডি-রুমে! সেই আলমারী-ছবি-কণ্টকিত প্রেতপুরীর মত ঘরে! নির্ভয়ের বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। কোন কথা বেরুল না মুখ দিয়ে।

—"এগারোটার আগে যেও না, আমি বড় ব্যস্ত থাকব। আজ রাতে তোমাকে এমন কিছু দেখাতে চাই, যা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তা হ'লে যেও, কেমন ?"

নির্ভয় কোন ক্রমে বলল—"আজ্ঞে আচ্ছা।"

নিশাকরবাবু উঠলেন। দরজায় কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—"হ্যাঁ, তুমি একা যাবে। আর একথা কাউকে বলবে না—মাসিমাকে নয়, বাঞ্ছাকেও না।"

নির্ভয় ঘাড় কাত করল। নিশাকরবাবু চ'লে গেলেন উপরে। তাঁর খড়মের শব্দ ভেসে এল—খট্—খট্—খট্—

নির্ভয়ের শোবার ঘর। রাত দশটা।

দুরু-দুরু বুকে নির্ভয় অপেক্ষা করছে। প'ড়ে উপরে আসবার কালে কাকার ষ্টাডি-রুমের দরজাটা সে একটুখানি খোলা পেয়েছিল। অজিন-চর্ম্মাবৃত টেবিলের উপর প্রকাণ্ড একটা ধূপদান। একটা গোল রূপার কৌটা হ'তে নিশাকরবাবু

ধূপদানে কি যেন ছড়িয়ে দিচ্ছেন আর বিড়বিড় ক'রে কি বলছেন। উগ্র গন্ধে ও ধোঁয়ায় ঘর ভ'রে উঠছে।

টেবিলের এককোণে রয়েছে একটি নর-কপাল!

সে-দৃশ্য মনে হ'তেই নির্ভয় ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। এসে দাঁড়াল জানালার পাশে।

শান্ত স্তব্ধ রাত। আকাশে ভরা চাঁদ। অনেক দূর হ'তে ভেসে আসছে নানা রহস্যময় শব্দ। হয়তো রাত্রিচর কোন পাখীর ডাক; হয়তো প্যাঁচার গুরু-শব্দ; হয়তো তার কোনটিই নয়। সে শব্দ ক্রমেই নিকটে আসছে—আরও নিকটে—আরও। বাগানের কাছে এসে শব্দ থেমে গেল। নির্ভয় কান পেতে আছে। কিন্তু—না, শব্দ থেমে গেছে। শান্ত স্তব্ধ রাত। আকাশে ভরা চাঁদ।

যাক। এবার নির্ভয় নিশ্চিন্ত। জানালাটা বন্ধ ক'রে ততক্ষণ বিছানায় শুয়ে 'কালো ভ্রমর' পড়া যাক। সহসা নির্ভয়ের চোখে পড়ল—

ষ্টাডি-রুমের নীচের দিকে বাগানের পথে দুটি ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে। জানালার দিকে তা'রা চেয়ে আছে। কি জানি কেন, মেয়েটিকে দেখেই নির্ভয়ের মনে প'ড়ে গেল কুঠরীর স্বপ্নে-দেখা সেই কঙ্কালের কথা। মুখে হাসি। দু'খানি হাত বুকের উপর চাপানো।

আর ছেলেটি। শুকনো ক্লান্ত চেহারা। বাঁকা-বাঁকা

বাঁকা বাঁকা আঙুল মেলে
হাত-দু'খানি তুলে
ধরেছে উপরের
দিকে···

আঙুল মেলে হাত-দু'খানি তুলে ধরেছে উপরের দিকে। কি যেন ধরতে চায় কঠিন মুঠিতে। চাঁদের আলোয় লম্বা লম্বা দশটি নখ ঝক্‌ঝক্ করছে ধারাল ছুরির মত।

ছেলেটির বুকের বাঁ-দিকে একটা প্রকাণ্ড ক্ষত। রক্তের ধারায় বুক ভাসছে।

শুধু মুহূর্ত্তের দেখা। দেখতে দেখতে তা'রা অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেয়ালের ঘড়িতে এগারোটা বাজল। ষ্টাডি-রুমে যাবার সময় হয়েছে। টেবিল-ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে নির্ভয় দরজা খুলল। সমস্ত শরীর কাঁপছে। বুক টিপ-টিপ করছে। কিন্তু যেতেই হবে। নির্ভয় ভীরু নয়।

ষ্টাডি-রুমের দরজা বন্ধ। নির্ভয় ডাকল—"কাকা।" পুরাণো বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনি বেজে উঠল—খা—খা।

নির্ভয় শুনতে পেল—ভিতরে কাকা কথা বলছেন। ওকি? তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? সে চীৎকার মাঝপথে রুদ্ধ হয়ে গেল কেন? তবে কি তিনিও সেই রহস্যময় ছেলেমেয়েকে দেখতে পেয়েছেন? কিন্তু তা হ'লে আবার সব চুপ কেন?

নির্ভয় সজোরে দরজায় লাথি মারল। দরজা খুলে গেল।

নিশাকরবাবুর প্রাণহীন দেহ চেয়ারে প'ড়ে আছে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে পিছনে। সারা মুখে আঁকা রয়েছে রাগ, ভয় ও যন্ত্রণার রেখা। বুকের বাঁ-দিকে একটা ভীষণ ক্ষত।

হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে পড়েছে। অথচ তাঁর হাতে রক্তের দাগ নেই। টেবিলের উপর প'ড়ে রয়েছে মস্তবড় ধারাল খড়্গ; তাও রক্ত-চিহ্নহীন!

পরম বিস্ময়। টেবিলের উপর কয়েকখানি কাগজ ইতস্ততঃ ছড়ানো। নিশাকরবাবুর নিজের হাতে লেখা। রুদ্ধশ্বাসে নির্ভয় সেগুলো পড়তে লাগল—

"......আমাদের আধুনিক সভ্যতার চোখে বর্ব্বরতা বলিয়া, বিবেচিত হইলেও এমন কতকগুলি সাধন-মার্গ আছে যাহার সাহায্যে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির চরম সমৃদ্ধিবিধান করা সম্ভব বলিয়া একশ্রেণীর প্রাচীন সাধকেরা বিশ্বাস করিতেন। যেমন, একজন মানুষের ব্যক্তিত্বকে নিজের মধ্যে নিঃশেষে আহরণ করিয়া অপর একজন মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতে পারে।

"তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ত্রিশূলাচার্য্য বলেন, একটি নিহত বালকের আত্মার সাহায্যে তিনি বাতাসে উড়িতে পারিতেন, অদৃশ্য হইতে পারিতেন এবং ইচ্ছামত যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারিতেন। কাপালিক চণ্ডপিশাচ সবিস্তারেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, একবিংশতি বর্ষের কম বয়স্ক তিন বা ততোধিক মানুষের শক্তি আহরণ করিয়া তিনি উপরিউক্ত শুভ ফল লাভ করিয়াছেন।

"এই সমস্ত তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করিতেই আমি জীবনের গত বিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। কিন্তু আমার পরীক্ষাকার্য্য চালাইবার জন্য আমি শুধু সেই সব মানুষকেই বাছিয়া লইয়াছি যাহাদের মৃত্যুতে সমাজের কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রথম শিকার হইল একটি জিপ্‌সি-বালিকা। তারপর পেলাম একটি পশ্চিমা বালক, নাম বিদেশীয়া। আমার শেষ শিকার—শুনিয়া আপনারা রোমাঞ্চিত হইবেন না—আমার আপন ভ্রাতুষ্পুত্র। অদ্য রাত্রি এগারোটা তাহার আত্মদান-ক্ষণ।

"জীবিত মানুষের হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহা ভস্মে পরিণত করা এবং কারণের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পান

করাই অপর মানুষের শক্তি আহরণের শ্রেষ্ঠ পন্থা। অবশ্য এইসব গতায়ুদের আত্মা—সাধারণ লোকেরা যাহাকে ভূত বলে—প্রতিহিংসা সাধনের নিমিত্ত কিছু কিছু বিঘ্ন-বিপদ ঘটাইতে প্রয়াসী হইবে। কিন্তু প্রকৃত দার্শনিকেরা—এইসব গূঢ় পরীক্ষাকার্য্যে একমাত্র তাহা-দেরই অধিকার—তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইবেন না। আমি আজ শুধু এই কথাই ভাবিতেছি যে, আমার পরীক্ষাকার্য্য সফল হইলে আমি যে শক্তি অর্জ্জন করিব তাহার ফলে আমি হইব অতিমানব—হইব মৃত্যুঞ্জয়।"

পরদিন পুলিশ এল। তদন্ত হ'ল। অনেক জেরা-জবরদস্তির পর নিশাকরবাবুর মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হ'ল। করোণারের বিচারে রায় হ'ল—গভীর রাতে ষ্টাডি-রুমের জানালা খোলা ছিল; সুতরাং বন্য-বিড়ালের হিংস্র নখরাঘাতেই শ্রীনিশাকর নন্দীর মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু একমাত্র নির্ভয় জানে, এ মৃত্যু-রহস্যের অন্তরালে রয়েছে তা'রা, নিঝুম রাতে যারা দূরপ্রান্তর পার হয়ে আসে নিঃশব্দ চরণে……যাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় রাত্রিচর পাখীর বিকট স্বর……চাঁদের আলোয় যাদের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলো ধারালো ছুরির মত ঝকঝক করে……

তখন অনেক রাত।

তমসাপ্রিয় স্বপ্ন দেখছে।

দেয়ালের গায়ে তার নিজের হাতে আঁকা সরস্বতীর ছবিখানি সহসা দুলে উঠল। তার চারদিক ঘিরে একটি উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল। ছবির ফ্রেম ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। পেছনের কাগজ গেল সে আলোয় ডুবে। সরস্বতীর চোখের পাতা কেঁপে উঠল। ঠোঁটে ফুটল হাসি।

সরস্বতী নেমে এল তমসাপ্রিয়ের বিছানায়। তার ভিজে চোখ দুটি মুছিয়ে বলল সান্ত্বনার স্বরে—“কেঁদো না তমসা, কেঁদো না। ছবি আঁকতে যে তুমি কত ভালবাসো সে তো আমি জানি।”

কাঁদতে কাঁদতে তমসাপ্রিয় বলল—“কিন্তু আর তো ছবি আঁকতে পারব না—আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি।”

সরস্বতী ঘাড় নেড়ে বলল—“জানি। কিন্তু এমন প্রতিজ্ঞা তুমি কেন ক’রে বসলে তমসা, এখন যে…”

বাধা দিল তমসাপ্রিয়—“প্রতিজ্ঞা না ক’রে আমি আর কি করি। দিনরাত এমন অকারণ গালমন্দ আর কত সহ্য হয় বল তো মা!”

সরস্বতী শুধু বলল—“সবই বুঝি তমসা।”

কিছুক্ষণ সব চুপ।

তমসাপ্রিয়ের দু’চোখে জল ঝরছে।

সরস্বতীর মুখের হাসি ধীরে মিলিয়ে গেল। কি একটা আসন্ন বেদনার ছায়া সেখানে পড়েছে।

ডান হাতখানি তমসাপ্রিয়ের কপালে রেখে সরস্বতী বলল খানিক পরে—“দুঃখ ক’রো না তমসা, এবার যে আমাকে যেতেই হবে।”

সরস্বতীর কথা শুনে তমসা ডুক্‌রে কেঁদে উঠল—“তা’ হ’লে তুমিও আমাকে ছেড়ে যাবে মা?”

সরস্বতীরও চোখে জল—"কি করব তমসা, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছ আর ছবি আঁকবে না। এর পরে কেমন ক'রে আমি এখানে থাকি বল তো?

তমসাপ্রিয় আবার কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা হ'ল না। সহসা উজ্জ্বল আলো নিভে গেল। সরস্বতী গেল অদৃশ্য হয়ে। তমসাপ্রিয় আর্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল।...

স্বপ্ন ভেঙে গেল।

একটা ঝড়ো হাওয়ায় দেয়ালে সরস্বতীর ছবিখানি কাঁপছে।

তমসাপ্রিয় ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে সেদিকে চেয়েই রইল।

সেদিন সন্ধ্যায় যে অঘটন ঘটেছিল, তার ছবিই ওর মনের আকাশে ভেসে বেড়াতে লাগল।

তমসাপ্রিয় থার্ড ক্লাসের ছাত্র। শ্যামলা রঙ। বড় বড় দুটি চোখ। পাতলা চুল সব সময়ই বাতাসে উড়ে। ক্লাসের যে কোন ছেলের চেয়ে ও দেখতে সুন্দর।

আমরা কিন্তু তমসাপ্রিয়ের আর একটি পরিচয় জানি। তমসাপ্রিয় শিল্পী। ও ছবি আঁকে। বেশ ভাল ছবি আঁকে। ওর পড়ার ঘরে গিয়ে দেখো—কত রকমের ছবি ও এঁকেছে। পড়বার টেবিলের ঠিক সাম্‌নেই টাঙানো রয়েছে সরস্বতীর একখানি ছবি। একহাতে বীণা, আর এক হাতে ছবি আঁকবার সরঞ্জাম-সাজানো থালা। সারা ছবিখানিতে একখানি বইও

দেখতে পাবে না। এর কারণ শুধালে ও হেসে জবাব দেয়—"বই পড়তে পড়তে আর বই টানতে টানতে মন বিরক্ত হয়ে গেছে ; ছবির পাশেও সেই বইয়ের বোঝা দেখলে মন সরস্বতীর উপরেও বেঁকে বসবে। তার চেয়ে এই ভাল—বীণা আর তুলি—সুর আর রেখা।"

এমন সুন্দর ক'রে ও কথাগুলো বলে, শুনতে ভারি ভাল লাগে। ওর মুখে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'র আবৃত্তি যদি তোমরা শোন, তা হ'লে পাগল হয়ে যাবে। চমৎকার!

বাঙলার মাষ্টার রমাপতিবাবুর কাছে তো তমসাপ্রিয়ের সাতখুন মাপ। বাঙলা পদ্য পড়াবার দিন ক্লাসে ঢুকেই তিনি বলেন—তমসা, তুমি আগে কবিতাটি আবৃত্তি কর, তারপর আমি পড়াব।"

বইয়ের সব কবিতা তমসার মুখস্থ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ও আবৃত্তি ক'রে যায়। ক্লাসের ছেলেরা স্তব্ধ হয়ে শোনে।

আবৃত্তি শেষ হ'লে রমাপতিবাবু বলেন—"চমৎকার!"

তারপর তিনি পড়াতে সুরু করেন—রাজা শিবাজীর কর্ম্মময় জীবনের কথা। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য আজীবন সাধনার কথা। ছায়াচ্ছন্ন পর্ব্বতশিখরে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখবার কথা।

একটি ছেলে হঠাৎ বলল—"তমসা যা একখানা ছবি এঁকেছে স্যার 'রাজা শিবাজী'র!"

মৃদু হেসে রমাপতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"সত্যি নাকি হে? কৈ আমাকে তো দেখাও নি?"

তমসাপ্রিয় লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে বলল—"কাল দেখাব স্যার। ছবিখানি সবে শেষ···"

ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজল। রমাপতিবাবু চ'লে গেলেন।···

তারপর অঙ্কের ক্লাস। বইয়ের পাতা উল্‌টাতে উল্‌টাতে প্রকাশবাবু ক্লাসে ঢুকলেন। ছেলেরা সন্ত্রস্ত হয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসল।

চেয়ারে না ব'সেই প্রকাশবাবু অঙ্ক দিলেন—স্কোয়ার-মেজার।

অঙ্কে তমসাপ্রিয় বড় কাঁচা।

আবৃত্তিতে তার মুখে খৈ ফোটে। ছবি আঁকতে তুলি চলে ঝর্ণার মত; কিন্তু অঙ্ক কষতে বসলেই সব যায় গুলিয়ে। তারপর এই স্কোয়ার-মেজার। তমসাপ্রিয় যাদব চক্রবর্ত্তীর সারা বইখানি হয়তো মুখস্থ ক'রে দিতে পারে; কিন্তু স্কোয়ার-মেজারের এই শক্ত অঙ্ক কষা ওর পক্ষে অসম্ভব। তমসাপ্রিয়ের আঙুল চুপ।

প্রকাশবাবু তাড়া দিলেন—"তাড়াতাড়ি। আরে অঙ্ক কষে শেষ করা, আর ভীম নাগের সন্দেশ খাওয়া—এ তো একই ব্যাপার। চালাও—চালাও—"

বকুনির ভয়ে তমসাপ্রিয়ের পেন্সিলও চলল। আপন মনে ও পেন্সিল ঘুরিয়ে চলছে। গভীর মনোযোগ। কোনদিকে খেয়াল নেই। পেন্সিল চলেইছে।

—"খুব অঙ্ক কষা হচ্ছে—অ্যাঁ ?"

এক ঝাঁকুনিতে তমসাপ্রিয়ের পেন্সিল গেল থেমে। ও যেন আকাশ থেকে পড়ল আছড়ে। বুক উঠল ধড়ফড়িয়ে।

প্রকাশবাবুর গলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"অঙ্কের নামে বেশ যে ছবি আঁকা হচ্ছে পটুয়া মশায়ের।"

সত্যি তাই। তমসাপ্রিয় অঙ্কের একটি লাইনও লেখে নি। ওর খাতায় আঁকা পড়েছে তুটি গোল চোখ।

প্রকাশবাবুর চোখ তুটি যেন জ্বলছে আগুনের মত।

চুপ ক'রে ব'সে থাকলে পাছে প্রকাশবাবু বকেন, তাই হিজি-বিজি একে ঘণ্টা কাবার করাই ছিল তমসাপ্রিয়ের মতলব। কিন্তু পেন্সিলের দাগ কাটতে কাটতে কখন যে ও ছবি আঁকতে সুরু করেছে—কখন যে প্রকাশবাবু এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন,—কিছুই ওর খেয়াল নেই। ছবি আঁকায় ও তখন এমনি তন্ময়।

প্রকাশবাবুর কড়া হাতের সাদর সম্ভাষণ আর কালো ঠোঁটের মিষ্টি-মধুর বকুনিতে ঘণ্টা কেটে গেল।

তমসাপ্রিয় মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল অবিরাম। ... ...

"অঙ্কের নামে বেশ যে ছবি আঁকা হচ্ছে…"

তমসাপ্রিয়ের দুর্ভোগের কিন্তু সেখানেই শেষ হ'ল না।

প্রকাশবাবু সব ব'লে দিলেন ওর কাকাবাবুকে। কাকাবাবু ভাল মানুষ; কিন্তু বড় একরোখা। যা করবেন তা করবেনই। প্রকাশবাবু তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন—'ছবি এঁকেই ছেলেটার মাথা বিগড়ে গেল, নইলে—।' কাকাবাবুও তাই বুঝলেন। ফলে সেদিন সন্ধ্যাতেই তমসাপ্রিয়ের ছবি আঁকার উপর ১৪৪ ধারা জারী হয়ে গেল—ছবি আঁকা ওর নিষেধ।

তবু তমসাপ্রিয় ছবি আঁকে। লুকিয়ে, ছাপিয়ে, যেমন ক'রে হোক ছবি আঁকে। স্কুল থেকে এসে সবাই খেলতে যায়। কাকাবাবু ক্লাবে চ'লে যান। তমসাপ্রিয় ব'সে ছবি আঁকে। রাত্রে সবাই যখন পড়ে ঘুমিয়ে, পড়বার ছল ক'রে ব'সে থেকে তমসাপ্রিয় তখন ছবিতে রঙ বুলোয়।

কিন্তু তাতেও লাঞ্ছনার হাত থেকে তো রেহাই নেই। কাকাবাবু জানতে পারলেই এক পশলা গালিবর্ষণ হয়ে যায়। তমসাপ্রিয় চুপ ক'রে সব শোনে; তবু ছবি আঁকে।

সেদিন সন্ধ্যা।

হাত-মুখ ধুয়ে তমসাপ্রিয় সবে পড়তে বসেছে।

টেবিলের উপর বই খুলতেই মনে পড়ল বিকালে আঁকা ছবিখানার কথা। 'রাজা প্রতাপের শেষশয্যা।' আঁকা শেষ হ'লে ছবিখানা ভাল ক'রে একবার দেখাও হয় নি।

তমসাপ্রিয় লোভ সামলাতে পারল না। টেবিল-ক্লথের নীচ থেকে সযত্নে ছবিখানা বের করল। বাঃ, ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় ছবিখানা আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। রাজা প্রতাপের মাথার চারদিকে জ্যোতিঃ সে আলোয় ঝিকমিক ক'রে উঠল।

আপনমনেই তমসাপ্রিয় আনন্দিত হয়ে উঠল।

কিন্তু—তমসাপ্রিয়ের মনে পড়ল—জানালার ফাঁকের আকাশে ভরা চাঁদ আঁকা তো ঠিক হয় নি। চাঁদকে মেঘে ঢেকে দিতে হবে।

ড্রয়ার টেনে তমসাপ্রিয় রঙ-তুলি বের করল। অতি যত্নে মেঘ-রঙ বুলিয়ে দিল চাঁদের গায়।

হঠাৎ সেই সময় পড়ার ঘরে ঢুকলেন কাকাবাবু। তমসাপ্রিয় চম্‌কে উঠল।

কর্কশ গলায় কাকাবাবু বললেন—"তোকে কতদিন নিষেধ করেছি ছবি আঁকতে। সে কথা কানে যাচ্ছে না—না? ফের যদি দেখি ছবি আঁকতে তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।"

টেবিলের উপরে ছবিখানি চোখে পড়তেই কাকাবাবু বেশ একটু খোঁচা দিয়ে বললেন—"দেখি দেখি, আজ আবার কোন্ রাজকন্মার ছবি আঁকা হচ্ছে!"

তমসাপ্রিয় কৈফিয়তের সুরে বলল—"এ-ছবি আমি বিকালে ব'সে এঁকেছি—"

কাকাবাবু তেড়ে উঠলেন—"থাক্, শাক দিয়ে আর মাছ

ঢাকতে হবে না। সবই আমি জানি। পড়াশুনো তো গোল্লায় দিয়েছ। প্রকাশবাবু রোজ আমার কাছে নালিশ করছেন— তুমি কিছু কর না। না বাড়ীতে, না স্কুলে। খালি আছে ওই ছাই-ভস্ম ছবি আঁকা। এঃ, কি আমার রবি বর্ম্মার পুষ্যিপুত্তুররে—"

তমসাপ্রিয় বলল—"কিন্তু পড়ার সময় তো আমি ছবি আঁকি না—"

কাকাবাবু রাশভারী লোক। চেঁচিয়ে উঠলেন—"হয়েছে। আর সাফাই গাইতে হবে না। পড়ার নাম ক'রে দিন-রাত্তির ছবি এঁকে মনে করছ ওল্ড-ফুলদের খুব ফাঁকি দিচ্ছ। ইডিয়ট কোথাকার—"

ছোঁ মেরে কাকাবাবু টেবিল থেকে ছবিখানা তুলে নিলেন। দু'হাতে সেখানাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন। মুখে ভৎর্সনার খৈ ফুটতে লাগল।

তমসাপ্রিয়ের বুকখানা কে যেন কেটে কুচি-কুচি ক'রে ফেলল। অব্যক্ত যাতনায় ওর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। কোন কথাই ও বলতে পারল না। ছবির ছেঁড়া টুকরোগুলো কাকাবাবু বাইরে ছুঁড়ে দিলেন।

হঠাৎ তমসাপ্রিয়ের মাথাটা ঘুরে গেল। কি যেন ভেবে ধা ক'রে রঙ, তুলি ও ছবি আঁকবার অন্যান্য সরঞ্জাম ভরা বাক্সটি কাকাবাবুর পায়ের সাম্‌নে নামিয়ে দিল। ওর হাত কাঁপছে।

…কাকাবাবুর পায়ের সাম্‌নে নামিয়ে দিল

জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে তমসাপ্রিয় বলল বেদনার্ত্ত গলায়—"আপনার পা ছুঁয়ে আজ প্রতিজ্ঞা করছি কাকাবাবু, আর কোন দিন আমি ছবি আঁকব না—আঁকব না—আঁকব না—"

কাকাবাবু বিস্মিত হ'লেন।

... ...

সেদিন অনেক রাতে স্বপ্ন দেখে তমসাপ্রিয়ের ঘুম ভেঙে গেল।

একটা ঝড়ো হাওয়ায় দেয়ালের সরস্বতীর ছবিখানি কাঁপছে।

তমসাপ্রিয় অশ্রু-ভেজা চোখে সেদিকেই চেয়ে রইল।

সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের পার্ট নিয়েই হ'ল মুশকিল।

বইয়ের সেরা পার্ট, কিন্তু কেউ নিতে রাজী নয়। অথচ অন্য পার্ট নিয়ে রীতিমত ঝগড়া বেধে যায়—ভাল পার্টটা কার ভাগ্যে যাবে।

নিতাই 'রূপবাসর'-এর আর্ট-ডিরেক্টার। মুরুব্বিয়ানা চালে সে বলল—"আরে, শ্রীকৃষ্ণই তো আসর জমিয়ে রাখবে। এ পার্ট যে নেবে, এবার পূজায় তো তারই বাজী মাত।

নিতাই সকলের দিকে একবার চোখ ঘুরাল। কাঠের জলচৌকিতে হ্যারিকেনটা দপ্-দপ্ করছে। কারও চোখেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পার্ট নেবার আগ্রহ দেখা গেল না।

নিতাই ওপাশের হ্যাংলা ছেলেটাকে বলল—"এই সতে, তুই নে না পার্টটা। তোকে বেশ মানাবে। বেশ শ্যাম্‌লা রঙ। তা ছাড়া দেখতেও তুই অনেকটা নুনুর মতই।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিতাইর বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস যেন ঠেলে উঠল। ঘরের বাতাস হয়ে উঠল ভারী, বেদনাতুর।

সতে ওরফে সতীশ বলল—"মাফ করো নিতুদা, কৃষ্ণের পার্ট আমি করতে পারব না। ও পার্ট নুনুদা যা ক'রে গেছে, তেমন আর কেউ করতে পারবে না। কৃষ্ণ সেজে ষ্টেজে যে নামবে, সে-ই গোবর খাবে।"

নিতাই জানে, কথাটা মিথ্যা নয়। এ পর্য্যন্ত যত 'রিলিজাস্' বই তা'রা প্লে করেছে, সবগুলোতেই কৃষ্ণের পার্ট করেছে নুনু। ওঃ, সে কি চমৎকার অভিনয়। যেমন একহারা শ্যাম্‌লা চেহারা, কোঁকড়া চুল, নীলাভ টানা দুটি চোখ, তেমনই মধুর গলা।

কিন্তু নুনু নেই ব'লে তো আর থিয়েটার বন্ধ হ'তে পারে না। নিতাই তাই গলা ঝাঁঝিয়ে উঠল—"হ্যাঃ, সে আবার একটা কথা। জানিস্ তোরা যে সাজাহানের পার্ট

শিশির ভাতুড়ী এমন মার্ভেলাস করত, সেই সাজাহানের পার্ট ক'রেই অহীন্দ্র চৌধুরী শেষে টেক্কা মেরে দিল। জানিস্ তোরা সে কথা ?"

সতীশ ঘাড় নীচু ক'রে বলল—"তুমি যাই বল নিতুদা, কৃষ্ণের পাঠ ক'রে ষ্টেজের উপর আমি টিটকারী খেতে পারব না।"

নিরাশ হয়ে নিতাই গণেশকে ধরল। কিন্তু গণেশও গররাজী, সে তো সুর ধ'রেই ব'লে উঠল—"ওরে বাপরে, পঙ্গু হয়ে লঙ্ঘিব সুমেরু ? দোহাই তোমার নিতুদা, সে আমাকে দিয়ে হবে না। জান তো সেবার মুনুদার অসুখ হ'লে কৃষ্ণের পার্টের জন্য কত রিহার্সেল দিলাম। মুনুদা অসুখ শরীরে কত শিখাল, তুমি হাত ধ'রে দেখিয়ে দিলে বারবার, কিন্তু কিছুতেই তার মত ক'রে বলতে তে পারলাম না ঃ

"ভেসে এস আকাশের নীলের তরঙ্গ,
এস কোথা জলদের আভা…"

রিহার্সেল-ঘর স্তব্ধ। সবারই মনে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের একটি দৃশ্য ভেসে উঠল ঃ সিংহাসনে দুর্য্যোধন, চারদিকে পাত্রমিত্র। নীচে পঞ্চপাণ্ডব। মাঝখানে দুঃশাসন ক্ষিপ্রহস্তে ভীতা ব্যাকুলিতা দ্রৌপদীর বসনাঞ্চল আকর্ষণ করছে। এমন সময় তীব্র জ্যোতিতে আবির্ভাব হ'ল শ্রীকৃষ্ণের।

দৃঢ়হাতে সুদর্শনচক্র ঘুরিয়ে দিয়ে সে ব'লে উঠল বজ্রগম্ভীর স্বরে—

"ভেসে এস আকাশের নীলের তরঙ্গ,
এস কোথা জলদের আভা..."

রিহার্সেল-ঘরে সমবেত সকলের কানে বাজতে লাগল একটি দূরে চ'লে যাওয়া কণ্ঠস্বর—সে স্বর নুনুর গলার।

পাগলা ঐতিহাসিক বইয়ের পক্ষপাতী। এবার সে সুযোগ বুঝে বলল—"সত্যি নিতুদা, কৃষ্ণের পার্ট আর আমাদের চলবে না, ও বই তুমি বাদ দাও। তার চেয়ে বরং একখানা ঐতিহাসিক বই-ই ধর এবার।"

নিতাই জবাব দিল—"না না, তা হয় না। একে তো পূজার বাজার। তাতে ও পাড়ার বুড়ো কর্ত্তা এবার কটা টাকা দেবে বলেছেন। কিন্তু কেষ্ট-বিষ্টু না হ'লে তাঁর মনও মজবে না, আর আমাদের চিঁড়েও ভিজবে না।"

যাহোক, শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে মিলল। বড় পার্টের লোভে ও সকলের অনুরোধে সতীশই কৃষ্ণ সাজতে রাজী হ'ল। রাতের দুটো তিনটে পর্য্যন্ত হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় রিহার্সেল চলতে লাগল।

দেখতে দেখতে পূজা এসে গেল। 'রূপবাসর'-এর কর্ম্মীরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে থিয়েটারের কাজে ব্যস্ত।

কেউ বাঁশ কাটছে, খাল খুঁড়ছে, ষ্টেজ বাঁধার কাজকর্ম্ম দেখছে। কেউ সহরে গেল প্রোগ্রাম ছাপাতে। কেউ বা ওপাড়ার কর্ত্তার কাছে গেছে লাল সালুর পর্দ্দাটা চেয়ে আনতে; ষ্টেজের স্ক্রীন হবে সেটা।

তার উপর আছে ড্রেস-পত্রের হাঙ্গামা। পাড়াগাঁয়ের সখের থিয়েটার। চারটে বহুরঞ্জিত দৃশ্যপট, একটা রঙচটা হার্মোনিয়ম, চেয়ে-আনা ডুগী-তবলা, আর তীর-ধনুক-বর্শা-ছোরা প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিস ছাড়া কিই বা আর আছে। অথচ থিয়েটার করতে হ'লে তো চাই সবই। রাজারাজড়ার পোষাক, বিচিত্র সাজসজ্জা, ঝকমকানো শিরস্ত্রাণ, কবচ-কুণ্ডল-মালা। আরও কত কি।

ড্রেস-সমস্যা নিয়ে তাই সকলে ব্যস্ত। অবশ্য চেষ্টার অসাধ্য পৃথিবীতে কিছু নেই এবং নেই ব'লেই প্রতি বছরই 'রূপবাসর'-এর থিয়েটার হাততালির ভিতর দিয়েই শেষ হয়ে আসছে এযাবৎ। এবারও হবে।

পোষাক কারও কারও নিজেরই একসেট ক'রে আছে। পাট-রেশমের রঙিন কাপড় একখানা, ফুলতোলা একটা জামা, একটা ওড়না আর ঝুটো মতির কিছু মালা, ব্যস্। দেবসভার ইন্দ্র হ'তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সেনাপতি পর্য্যন্ত সকলেরই এই পোষাক। আর এও যাদের নেই, তা'রা কোন-রকম ক'রে বৌদির শাড়ীখানা, বড়দির ব্লাউজটা,

চার পয়সার ফুকার দানার মালাছড়া—এই দিয়েই কাজ সেরে নেয়। মোট কথা, অভিনয় অচল থাকে না।

এবার কিন্তু গোল বাধাল সতীশ। একে তো সকলে ব'লে কয়ে তাকে কৃষ্ণের পার্ট করতে রাজী করিয়েছে, তার উপর রিহার্সেলেও সে উতরেছে ভালই। সুতরাং বায়নাক্কাও তার বেড়ে গেছে। এতদিন সে মুনিঋষির পার্ট ক'রে আসছে। ঠাকুরমার নামাবলী দিয়েই সেরেছে কাজ। অন্য কোন ড্রেসপত্র তার কিছুই নেই। এবার সে বেঁকে বসল—"ভাল পোষাক না পেলে ষ্টেজে নেমে আমি লোক হাসাতে পারব না।"

ভাল পোষাক পাওয়া তো সোজা কথা নয়। যাদের ছ-এক সেট আছে, তা'রাই বা তা দিতে যাবে কেন। সখ-আহ্লাদ তো তাদেরও আছে।

নিতাই ঠিক করেছিল,—কিছু ঝুটো মতি এনে মালা, কবচ, কুণ্ডল বানিয়ে দেবে, আর নীল কাপড় সাজিয়ে গুছিয়ে ষ্টেজ মাত ক'রে দেবে।

কিন্তু সতীশ এত সহজে মাত হ'ল না। ভাল পোষাক তার চাই-ই।

নিতাই ঠোঁট ঝাঁকি দিল—"ভাল পোষাক মানে—কি পোষাক তোর চাই বল্ তো?"

সতীশ জবাব দিল—"ভাল হ'লেই হ'ল। এই—নুনুদা যেমন পোষাক প'রে নামত ষ্টেজে তেমনই।"

নুনুর কৃষ্ণের ড্রেসটি ভারী সুন্দর। একসেট মালা। লাল-নীল পাথর-বসানো তাতে। মাথায় চূড়া। গায় হল্‌দে অরগ্যান। পিঠে পীতবসন। পরণে হল্‌দে পাটের কাপড়, পায় ভেলভেটের হল্‌দে নাগরা। চমৎকার!

শ্রীকৃষ্ণ-বেশী নুনুর ছবি ভেসে উঠল সকলের চোখে। সারা কপালে চন্দন-লেখা। নাকের উপর রসকলি। গায় ঝকঝকে পোষাক। হাতে পিতলের চকচকে বাঁশী। বেশ বাঁশী বাজাত নুনু।

নুনুর থিয়েটারের ভারী সখ। পূজার জুতা কিনবার জন্যে পাঁচ টাকা আদায় ক'রে নিল বাবার কাছ থেকে। সহরে গিয়ে আঠার আনা দিয়ে কিনল সাদা কেড্‌স্। আর বাকী টাকা দিয়ে তৈরী ক'রে নিয়ে এল জমকালো একটা অরগ্যান-পোষাক। ভোলানাথ অপেরার শ্রীকৃষ্ণ যেমন গায় দিয়েছিল অবিকল তেমনই একটি জরির ফুলকাটা হল্‌দে রঙের অরগ্যান-পোষাক।

গণেশ বলল—"নুনুদার পোষাকটা হ'লে সতেকে বেশ মানাত কিন্তু সত্যি।"

নিতাই জবাব দিল নিরাশার স্বরে—"সে পোষাক তো

তার মার কাঠের সিন্ধুকে আটকানো। তা আর এখন পাওয়া যাচ্ছে কোথায়।"

গণেশ চট্‌পট্‌ উত্তর দিল—"কেন? চাইলেই হয় তার মার কাছে। একটা রাতের জন্যে তো মোটে।"

নিতাই চোখ তুলল, সেখানে ব্যথার ছায়া—"কিন্তু ওর মার কাছে কি তা চাওয়া যায় রে? চাইতে গেলেই ওর মা যে ডুঁকরে কেঁদে উঠবে।"

—"সরাসরি কি আর চাইতে হয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক সময় কথাটা পাড়তে হয় আর কি।"

—"তুই পারবি বলতে গণেশ?"

গণেশ হঠাৎ কথা বলতে পারল না। থেমে গেল। একটু পরে বলল—"এক রকম ক'রে বলতেই হবে। নইলে যে থিয়েটারই মাটি হয়ে যায়।"

এই ঠিক হ'ল। সেদিন সন্ধ্যার পরেই গণেশ মুন্নুর মায়ের কাছে হাজির হ'ল এবং নানা কথার ফাঁকে কৃষ্ণের পোষাকটা একরাতের জন্য চেয়ে এল। মুন্নুর মা রাজী হয়েছে।

সতীশ নূতন দম নিয়ে পার্ট মুখস্থ করতে লাগল।

সপ্তমী পূজার দিন থিয়েটার।

কাক-ভোরে উঠে গণেশ সহরে গেছে প্রোগ্রাম আনতে। বেলা গড়িয়ে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তার দেখা নেই।

…চন্দনের ফোঁটা এঁকে দেওয়া হয়েছে হুঁসারি ক'রে
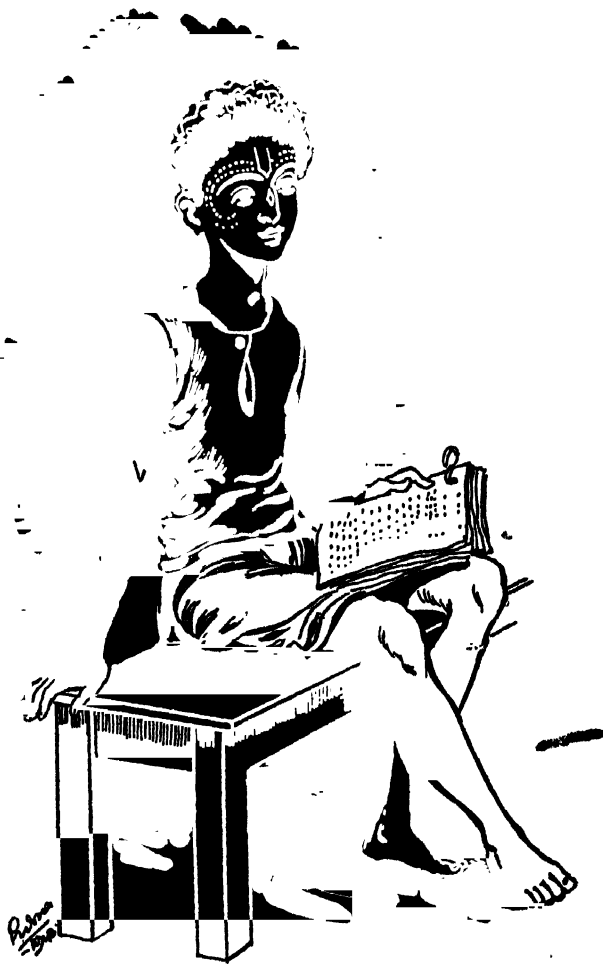
সকলে মহা ভাবনায় পড়ল। দুপুরের পরে ছিঁটেফোঁটা খানিকটা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। সহরের ওদিকে জল নামে নি তো। তা হ'লে তো সর্ব্বনাশ। কাঁচা রাস্তা। গণেশ সাইক্‌ল্ নিয়ে গেছে।

সন্ধ্যা ক্রমে রাতের আঁধারে মিশে গেল। পূজা-মণ্ডপে আরতির ঢাক বেজে বেজে থেমে গেল। গণেশ এল না।

'রূপবাসর'-এর কর্ম্মিবৃন্দ 'গ্রীন রুম' নিয়ে ব্যস্ত। পার্টের তাড়া হাতে নিয়ে সতীশ ব'সে আছে একটা টুলে। তার 'পেন্ট' শেষ হয়েছে। সমস্ত কপালেও গালের নীচু অবধি চন্দনের ফোঁটা এঁকে দেওয়া হয়েছে দু'সারি ক'রে। নাকের উপর আঁকা হয়েছে সরু রসকলি।

এখন পোষাকটা এলেই হয়।

কিন্তু পোষাক যে আনবে সেই শ্রীমান গণেশেরই যে পাত্তা নেই এখনও। যতসব দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে। সেই ভোরে গেছে সহরে, এখনও ফিরবার নাম নেই। কর্ম্মীরা সব রাগে ফেটে পড়তে লাগল।

বাইরে লোকজন জমা হয়েছে বিস্তর। চারদিকে হাঁকডাক সুরু হয়েছে। ভিতরে কনসার্টের টুংটাং শব্দ উঠছে। রামচরণ সিনের দড়ি ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। সর্ব্বত্র উচ্চকিত প্রত্যাশা। অথচ—

নিতাই মরিয়া হয়ে গর্জ্জে উঠল চাপা গলায়—"নাঃ, এ

অকর্ম্মার আশায় ব'সে থাকলে আজ আর জাতমান থাকবে না। আমিই যাচ্ছি পোষাক আনতে। তোমরা কেউ একজন এস আমার সাথে। যতসব ছেলেমানুষ নিয়ে কারবার।"

নিতাই আবছা আঁধারে একাই বেরিয়ে গেল জোরকদমে। পাগলা তাড়াতাড়ি একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে তার পিছু নিল। প্রথম বেল দিয়ে তখন জোর কনসার্ট সুরু হ'ল।

নুনুদের উঠানে পা দিয়েই নিতাই থমকে দাঁড়াল।

পাগলা চম্‌কে শুধাল—"কি নিতুদা?"

নিতাই ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে বলল—"আস্তে। শুনছিস্?"

দু'জনে কান পাতল। ভিতরে চাপা আর্ত্তনাদ। কে যেন কাঁদছে। দুঃসহ যাতনায় কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে।

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাল। তাদের চোখে জিজ্ঞাসা।

নিতাই বলল—"নুনুর মা।"

দু'জনে খানিক দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে। কান্নার শেষ নেই। দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ ক্রন্দনধারা আজ যেন মুক্তি পেয়েছে প্রকাশের সমতলক্ষেত্রে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল ওরা। কনসার্টের শব্দ কানে আসছে। লোকজনের হৈ-চৈ ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিটি সেকেণ্ড উঠা-নামা করছে ওদের বুকে। আর ওরা দেরী করতে

পারে না। অথচ সাহস ক'রে মুন্নুর মাকে ডাকতেও পারছে না।

অতিষ্ঠ হয়ে নিতাই জানালার পাশের পেয়ারা গাছটায় উঠল অতি সতর্ক পায়ে। দোডালায় দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েই নিতাই শিউরে উঠল। মুন্নুর সমস্ত ড্রেস বিছানার উপর ছড়িয়ে মুন্নুর মা উপুড় হয়ে প'ড়ে কাঁদছে। বিশ্রস্ত বসন। একরাশ রুক্ষ চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে। কান্নার আবেগে সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠছে ঝড়ের সাগরের মত।

ধীরে ধীরে পেয়ারা গাছ থেকে নেমে নিতাই বলল—"চল্।"

—"কোথায় নিতুদা?"

—"থিয়েটারের ওখানে।"

—"পোষাক?"

—"পোষাক নেওয়া হবে না।"

নিতাই পা চালিয়ে দিল। পিছু পিছু এসে পাগলা শুধাল পরম বিস্ময়ে—"কেন? কি হ'ল নিতুদা?"

নিতাই হাঁটতে হাঁটতেই জবাব দিল—"মাত্র সাত মাস আগে যে মারা গেছে তারই মার কাছ থেকে তার পোষাক এনে থিয়েটার করা যায় না রে, পাগলা। মানুষে তা পারে না।"

তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

থিয়েটার সে রাতে হয়েছিল। তবে আরম্ভ হবার আগে

দোডালায় দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েই নিতাই শিউরে উঠল

নিতাই স্বয়ং দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—"আধুনিক রুচি অনুযায়ী কৃষ্ণচরিত্রের উপর আমরা নূতন আলোকপাত করতে চাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ আজ সম্পূর্ণ একবস্ত্রে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন। বিশ্ব যাঁর অম্বর, তাঁর কি প্রয়োজন জমকালো পোষাকের আর ঝুটো মতির মালার?"

ছেলেরা হাততালি দিয়ে উঠল।

পাশের গাঁয়ের 'অরুণোদয়-নাট্যসঙ্ঘ'-এর সদস্যগণ দল বেঁধে এসেছিল থিয়েটার দেখতে। তাদের একটি ছোকরা টিপ্পনী কেটে উঠল—"বুঝেছি। ভাল পোষাক জোটে নি ব'লে শ্রীকৃষ্ণ এবার সন্ন্যাসধর্ম্ম নিয়েছে।"

একটা হাসির রোল প'ড়ে গেল। 'রূপবাসর'-এর ড্রপসিন তখন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে।

শেষ